পঞ্চম অধ্যায়

সর্বকারণের কারণ

শ্লোক ১

নারদ উবাচ

দেবদেব নমস্তেঽস্তু ভূতভাবন পূর্বজ।
তদ্বিজানীহি যজ্জ্ঞানমাত্মতত্ত্বনিদর্শনম্ ॥ ১ ॥

নারদঃ উবাচ—শ্রী নারদ বললেন; **দেব**—সমস্ত দেবতাদের; **দেব**—দেবতা; **নমঃ**—প্রণতি; **তে**—আপনাকে; **অস্তু**—হয়; **ভূতভাবন**—সমস্ত জীবের স্রষ্টা; **পূর্বজ**—প্রথম জন্মা; **তৎ-বিজানীহি**—দয়া করে সেই জ্ঞান দান করুন; **যজ্জ্ঞানম্**—সেই জ্ঞান; **আত্মতত্ত্ব**—চিন্ময়; **নিদর্শনম্**—বিশেষভাবে নির্দেশ করে।

অনুবাদ

শ্রী নারদমুনি ব্রহ্মাকে বললেনঃ হে দেবাদিদেব! আপনি সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে প্রথম জন্মা, আমি আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। কৃপা করে আপনি আমাকে দিব্য জ্ঞান দান করুন, যা মানুষকে আত্মা এবং পরমাত্মার তত্ত্ব বিশেষভাবে জ্ঞাপন করে।

তাৎপর্য

এখানে গুরু-শিষ্য পরম্পরার প্রণালীর সার্থকতা পুনরায় প্রতিপন্ন হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রতিপন্ন হয়েছে যে প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মা সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেছিলেন, এবং সেই জ্ঞান তিনি তাঁর শিষ্য নারদকে দান করেছিলেন। নারদ সেই জ্ঞান ভিক্ষা করেছিলেন এবং ব্রহ্মা তাঁকে তা দান করেছিলেন। তাই, উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে দিব্য জ্ঞান ভিক্ষা করা এবং যথাযথভাবে তা প্রাপ্ত হওয়াই পরম্পরার বিধান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/২) এই প্রথা অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জিজ্ঞাসু শিষ্যের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে যোগ্য গুরুর শরণাগত হয়ে বিনীত জিজ্ঞাসা এবং সেবার মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে দিব্য জ্ঞান লাভ করা। বিনীত জিজ্ঞাসা এবং সেবার মাধ্যমে লব্ধ যে, জ্ঞান তা অর্থের বিনিময়ে লব্ধ জ্ঞানের থেকে অধিক ফলপ্রদ। ব্রহ্মা এবং নারদের পরম্পরায় অধিষ্ঠিত গুরু কখনো টাকা-পয়সার আকাঙ্ক্ষা

করেন না। ঐকান্তিক সেবার দ্বারা সদ্ গুরুকে সন্তুষ্ট করার মাধ্যমে আদর্শ শিষ্যকে আত্মা এবং পরমাত্মার প্রকৃতি ও তাদের পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করতে হয়।

শ্লোক ২

যদ্রূপং যদধিষ্ঠানং যতঃ সৃষ্টমিদং প্রভো।
যৎসংস্থং যৎপরং যচ্চ তত্তত্ত্বং বদ তত্ত্বতঃ ॥ ২ ॥

যৎ—যা ; **রূপম্**—লক্ষণ ; **যৎ**—যা ; **অধিষ্ঠানম্**—পটভূমি ; **যতঃ**—যেখান থেকে ; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট ; **ইদম্**—এই জগৎ ; **প্রভো**—হে পিতৃদেব ; **যৎ**—যাতে ; **সংস্থম্**—সংরক্ষিত ; **যৎ**—যা ; **পরম্**—বশীভূত ; **যৎ**—যা হয় ; **চ**—এবং ; **তৎ**—তার ; **তত্ত্বম্**—লক্ষণসমূহ ; **বদ**—দয়া করে বর্ণনা করুন ; **তত্ত্বতঃ**—বাস্তবভাবে।

অনুবাদ

হে পিতা ! কৃপা করে আপনি আমাকে এই ব্যক্ত জগতে বাস্তবিক লক্ষণসমূহ বর্ণনা করুন। তার আশ্রয় কি ? কিভাবে তার সৃষ্টি হয়েছে ? কিভাবে তার সংরক্ষণ হয় ? এবং কার নিয়ন্ত্রণে এই সবকিছু সম্পাদিত হচ্ছে ?

তাৎপর্য

বাস্তবিক কারণ এবং কার্যের ভিত্তিতে নারদমুনির প্রশ্নগুলি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। নাস্তিকেরা কিন্তু তাদের মনগড়া বহু মতবাদ উপস্থাপন করে যেগুলির কার্য এবং কারণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। ভগবৎ-বিদ্বেষী নাস্তিকেরা তাদের গবেষণা লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বহু মতবাদ সৃষ্টি করেছে, তথাপি ব্যক্ত জগত এবং চিন্ময় আত্মার রহস্য তারা উদ্‌ঘাটন করতে পারেনি। নারদ মুনি কিন্তু সৃষ্টি সম্বন্ধে তাদের মতো জল্পনা কল্পনা না করে যথাযথভাবে তার তত্ত্ব অবগত হতে চেয়েছিলেন।

আত্মা এবং পরমাত্মা সম্বন্ধীয় দিব্য জ্ঞানে জগৎ এবং তার সৃষ্টি সম্বন্ধীয় জ্ঞান নিহিত রয়েছে। যে কোন বুদ্ধিমান মানুষ এই জগতে বাস্তবিকভাবে তিনটি জিনিস দেখতে পান—জীব, জগৎ এবং তাদের উপর পরম নিয়ন্ত্রণ। বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতে পারেন যে জীব এবং জগত উভয়েরই সৃষ্টি ঘটনাক্রমে হয়নি। সৃষ্টি এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এমনই একটি সুন্দর সামঞ্জস্য রয়েছে যে, তা দেখে বোঝা যায় যে, তার পিছনে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পরিকল্পনা রয়েছে, এবং কোন তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তির সহায়তায় ঐকান্তিক প্রশ্নের মাধ্যমে সর্ব কারণের পরম কারণ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।

শ্লোক ৩

সর্বং হ্যেতদ্ভবান্ বেদ ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ।
করামলকবদ্বিশ্বং বিজ্ঞানাবসিতং তব ॥ ৩ ॥

সর্বম্—সবকিছু; **হি**—অবশ্যই; **এতৎ**—এই; **ভবান্**—আপনি; **বেদ**—জানেন; **ভূত**—যা কিছুর সৃষ্টি হয়েছে বা জন্ম হয়েছে; **ভব্য**—যা কিছুর সৃষ্টি হবে বা জন্ম হবে; **ভবৎ**—যা কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে; **প্রভুঃ**—সব কিছুর স্বামী, আপনি; **করামলকবৎ**—আপনার মুঠোয় আমলকীর মতো; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ডে; **বিজ্ঞান-অবসিতম্**—আপনার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অন্তর্গত; **তব**—আপনার।

অনুবাদ

হে পিতা, এই সব কিছুই আপনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানেন কেননা পূর্বে আপনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, ভবিষ্যতে যা কিছু সৃষ্টি হবে এবং বর্তমানে যা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে, এবং এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু রয়েছে তা সবই আপনার হস্তস্থিত একটি আমলকীর মতো।

তাৎপর্য

এই ব্যক্ত ব্রহ্মাণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সে সবেরই সাক্ষাৎ স্রষ্টা হচ্ছেন ব্রহ্মা। তাই তিনি জানেন পূর্বে কি হয়েছিল, ভবিষ্যতে কি হবে, এবং বর্তমানে কি হচ্ছে। তিনটি মুখ্য বস্তু যথা জীব, জগৎ এবং ঈশ্বর, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, সর্বদাই কার্যশীল। এবং যিনি প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপক, তিনি তাঁর হস্তধৃত একটি আমলকীর মতো, সেই সমস্ত বিষয়ে কার্য এবং কারণ সম্বন্ধে সমস্তই অবগত। কেউ যখন কোন কিছু তৈরি করেন, তখন সেই বস্তুটি সম্বন্ধে সবকিছু জানা তার পক্ষে স্বাভাবিক, যেমন সেই বস্তুটি তৈরি করার কলা তিনি কিভাবে শিখেছিলেন, তার উপাদান তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন, কিভাবে তিনি সেগুলি আয়োজন করেছেন এবং কিভাবে সেগুলির উৎপাদন চলছে। ব্রহ্মা যেহেতু প্রথম জন্মা জীব, তাই তাঁর পক্ষে সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে সবকিছু জানা স্বাভাবিক।

শ্লোক ৪

যদ্বিজ্ঞানো যদাধারো যৎপরস্ত্বং যদাত্মকঃ।
একঃ সৃজসি ভূতানি ভূতৈরেবাত্মমায়য়া ॥ ৪ ॥

যৎ-বিজ্ঞানঃ—জ্ঞানের উৎস; **যৎ-আধারঃ**—যাঁর আশ্রয়; **যৎপরঃ**—যাঁর অধীনে; **তম্**—আপনি; **যদাত্মকঃ**—যেই ক্ষমতায়; **একঃ**—একলা; **সৃজসি**—আপনি সৃষ্টি করছেন; **ভূতানি**—জীবসমূহ; **ভূতৈঃ**—জড় উপাদানের সাহায্যে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আত্ম**—স্বীয়; **মায়য়া**—শক্তির দ্বারা।

অনুবাদ

হে পিতা ! আপনার জ্ঞানের উৎস কি ? আপনি কার আশ্রয়ে রয়েছেন ? এবং কার অধীনে আপনি কার্য করছেন ? আপনার বাস্তবিক স্থিতি কি ? আপনি কি আপনার শক্তির দ্বারা জড় উপাদানের সাহায্যে সমস্ত জীবদের সৃষ্টি করেন ?

তাৎপর্য

শ্রীনারদমুনি জানতেন যে, ব্রহ্মা কঠোর তপস্যা করার মাধ্যমে সৃজনাত্মক শক্তি লাভ করেছিলেন। অতএব তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ব্রহ্মার থেকেও শ্রেষ্ঠ কেউ একজন আছেন যিনি ব্রহ্মাকে সৃজনী শক্তি দান করেছিলেন। তাই উপরোক্ত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করেছেন। বৈজ্ঞানিকেরা বিজ্ঞানের প্রগতির মাধ্যমে যা কিছু আবিষ্কার করছেন তা স্বতন্ত্র নয়। বৈজ্ঞানিকদের উর্বর মস্তিষ্কের সাহায্যে বিদ্যমান বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হয়, আর সেই মস্তিষ্ক অন্য একজন তৈরি করেছেন। যে মস্তিষ্কের সাহায্যে বৈজ্ঞানিকেরা কাজ করেন, সে রকম আর একটি মস্তিষ্ক তৈরি করা বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কোন বস্তু সৃষ্টির ব্যাপারে কেউ স্বতন্ত্র নয়, এবং এই সৃষ্টিও আপনা থেকে হয় না।

শ্লোক ৫

আত্মন্ ভাবয়সে তানি ন পরাভাবয়ন্ স্বয়ম্ ।
আত্মশক্তিমবষ্টভ্য ঊর্ণনাভিরিবাক্লমঃ ॥ ৫ ॥

আত্মন্ (আত্মনি)—নিজের দ্বারা ; **ভাবয়সে**—প্রকাশ করে ; **তানি**—সেই সব ; **ন**—না ; **পরাভাবয়ন্**—পরাভূত হয়ে ; **স্বয়ম্**—আপনি ; **আত্মশক্তিম্**—স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তি ; **অবষ্টভ্য**—নিযুক্ত হয়ে ; **ঊর্ণনাভিঃ**—মাকড়সা ; **ইব**—সদৃশ ; **অক্লমঃ**—সহায়তা বিনা।

অনুবাদ

মাকড়সা যেমন অনায়াসে কারো দ্বারা পরাভূত না হয়ে জাল সৃষ্টি করে, আপনিও তেমন অন্য কারো সাহায্য ব্যতীত, আপনার স্বয়ংসম্পূর্ণ শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি করেন।

তাৎপর্য

স্বয়ংসম্পূর্ণতার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হচ্ছে সূর্য। সূর্যকে আলোক প্রদান করার জন্য কারো সাহায্য গ্রহণ করতে হয় না। পক্ষান্তরে, সূর্য অন্য সমস্ত আলোক প্রদানকারী বস্তুদের সাহায্য করে, এবং সূর্যের উপস্থিতিতে অন্য সমস্ত জ্যোতির্ময় বস্তু প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। সৃষ্টির ব্যাপারে ব্রহ্মার স্বয়ংসম্পূর্ণতা নারদমুনি মাকড়সার স্বয়ংসম্পূর্ণতার সঙ্গে তুলনা করেন, যে অন্য কারো সহায়তা ব্যতীত তার লালা দিয়ে তার কার্যক্ষেত্র তৈরি করে।

শ্লোক ৬

নাহং বেদ পরং হ্যস্মিন্নাপরং ন সমং বিভো।
নামরূপগুণৈর্ভাব্যং সদসৎ কিঞ্চিদন্যতঃ ॥ ৬ ॥

ন—না ; **অহম্**—আমি ; **বেদ**—জানি ; **পরম**—উৎকৃষ্ট ; **হি**—কেননা ; **অস্মিন্**—এই জগতে ; **ন**—না ; **অপরম্**—নিকৃষ্ট ; **ন**—না ; **সমম্**—সমান ; **বিভো**—হে মহান্ ; **নাম**—নাম ; **রূপ**—লক্ষণ ; **গুণৈঃ**—যোগ্যতার দ্বারা ; **ভাব্যম্**—যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে ; **সৎ**—নিত্য ; **অসৎ**—অনিত্য ; **কিঞ্চিৎ**—অথবা এই প্রকার কোন বস্তু ; **অন্যতঃ**—অন্য কোন সূত্র থেকে।

অনুবাদ

নাম, রূপ, গুণ ইত্যাদির মাধ্যমে বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে আমরা যা কিছু জানতে পারি, তা উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট অথবা সমান হোক অথবা নিত্য বা অনিত্য হোক, তা সবই আপনি ছাড়া আর কারো দ্বারা সৃষ্টি হয়নি, আপনি এতই মহান্।

তাৎপর্য

এই ব্যক্ত জগত ৮৪,০০,০০০ যোনি থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার জীবে পরিপূর্ণ। তাদের মধ্যে কেউ উৎকৃষ্ট আবার কেউ অন্যদের থেকে নিকৃষ্ট। মানুষদের উৎকৃষ্ট জীব বলে বিবেচনা করা হয়, আবার মানুষদের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ রয়েছে—ভাল, মন্দ, সম ইত্যাদি। কিন্তু নারদ মুনির বদ্ধমূল ধারণা যে, তাঁর পিতা ব্রহ্মা ব্যতীত তাদের অন্য কারোর সৃষ্টি করার শক্তি নেই। তাই তিনি তাদের সম্বন্ধে ব্রহ্মার কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন।

শ্লোক ৭

স ভবানচরদ্ ঘোরং যত্তপঃ সুসমাহিতঃ।
তেন খেদয়সে নস্ত্বং পরাশঙ্কাঞ্চ যচ্ছসি ॥ ৭ ॥

সঃ—তিনি ; **ভবান্**—আপনি ; **অচরৎ**—করেছেন ; **ঘোরম্**—কঠোর ; **যৎ-তপঃ**—ধ্যান ; **সুসমাহিতঃ**—পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতায় ; **তেন**—সেই কারণে ; **খেদয়সে**—কষ্ট দেয় ; **নঃ**—আমাদের ; **ত্বম্**—আপনি ; **পরা**—পরম সত্য ; **শঙ্কাম্**—সন্দেহ ; **চ**—এবং ; **যচ্ছসি**—আমাদের সুযোগ দেয়।

অনুবাদ

আপনি যদিও সৃষ্টির ব্যাপারে অত্যন্ত শক্তিশালী, তথাপি আপনি যে পূর্ণরূপে অনুশাসন অনুসরণ করে কঠোর তপস্যা করেছেন সে কথা ভেবে আমরা আশ্চর্যান্বিত

চিত্তে অনুমান করি যে, আপনার থেকেও অধিক শক্তিশালী আর কেউ একজন রয়েছেন।

তাৎপর্য

নারদ মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করে মানুষের কর্তব্য অন্ধের মতো তার গুরুকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে মনে না করা। গুরুদেবকে ভগবানের মতো সম্মান করা হয়, কিন্তু গুরু যদি দাবী করে যে, সে ভগবান তা হলে তাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা উচিত। ব্রহ্মার সৃষ্টি বিষয়ক অদ্ভুত কার্যকলাপ দর্শন করে নারদ মুনি ব্রহ্মাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, ব্রহ্মাও তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ আর কারো উপাসনা করছেন, তখন তাঁর মনে সন্দেহের উদয় হয়েছিল। পরমেশ্বর হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতম, এবং তাঁর আরাধ্য কেউ নেই। *অহংগ্রহ* উপাসনা বা ভগবান হবার উদ্দেশ্যে নিজের পূজা করা একটি মস্ত বড় ভ্রষ্টাচার। বুদ্ধিমান শিষ্য বুঝতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবানকে ভগবান হওয়ার জন্য কারো উপাসনা করতে হয় না, এমনকি তাঁর নিজের উপাসনাও করতে হয় না। দিব্য জ্ঞান লাভের জন্য *অহংগ্রহ* উপাসনা একটি পদ্ধতি হতে পারে, কিন্তু *অহংগ্রহ* উপাসনার মাধ্যমে কেউ ভগবান হতে পারে না। কোন পারমার্থিক উপলব্ধি লাভের পন্থা অনুসরণ করার মাধ্যমে কেউ কখনো ভগবান হতে পারে না। নারদ মুনি ব্রহ্মাজীকে পরম পুরুষ বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, ব্রহ্মাজীও পারমার্থিক তত্ত্ব উপলব্ধির অনুশীলনে যুক্ত, তখন তাঁর হৃদয়ে সন্দেহের উদয় হয়েছিল, তাই তিনি যথাযথভাবে সে সম্বন্ধে জানতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৮

এতন্মে পৃচ্ছতঃ সর্বং সর্বজ্ঞ সকলেশ্বর।
বিজানীহি যথৈবেদমহং বুধ্যেঽনুশাসিতঃ ॥ ৮ ॥

এতৎ—এই সমস্ত; **মে**—আমাকে; **পৃচ্ছতঃ**—জিজ্ঞাসু; **সর্বম্**—সমস্ত জিজ্ঞাস্য বিষয়; **সর্বজ্ঞ**—যিনি সবকিছু জানেন; **সকল**—সকলের; **ঈশ্বর**—নিয়ন্তা; **বিজানীহি**—দয়া করে বিশ্লেষণ করুন; **যথা**—যেমন; **এব**—তারা হয়; **ইদম্**—এই; **অহম্**—আমি; **বুধ্যে**—বুঝতে পারি; **অনুশাসিতঃ**—আপনার কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে।

অনুবাদ

হে পিতা! আপনি সবকিছু জানেন, এবং আপনি সকলের নিয়ন্তা। তাই আমি যে সমস্ত প্রশ্ন আপনার কাছে করেছি, আপনি কৃপা করে আমাকে তার উত্তর দিন যাতে আমি আপনার শিষ্যরূপে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি।

তাৎপর্য

নারদমুনি যে প্রশ্নগুলি করেছেন তা সকলেরই জন্য অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ, তাই নারদমুনি ব্রহ্মাজীর কাছে প্রার্থনা করেছেন তিনি যেন সেগুলি উপযুক্ত বলে মনে করেন যাতে ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের পরম্পরায় যাঁরা আসবেন তাঁরা সকলেই যেন অনায়াসে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

শ্লোক ৯

ব্রহ্মোবাচ

সম্যক্ কারুণিকস্যেদং বৎস তে বিচিকিৎসিতম্।
যদহং চোদিতঃ সৌম্য ভগবদ্বীর্যদর্শনে ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মাজী বললেন ; **সম্যক্**—যথাযথভাবে ; **কারুণিকস্য**—অত্যন্ত দয়ালু তোমার ; **ইদম্**—এই ; **বৎস**—হে পুত্র ; **তে**—তোমার ; **বিচিকিৎসিতম্**— জানবার স্পৃহা ; **যৎ**—যার দ্বারা ; **অহম্**—আমি ; **চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত ; **সৌম্য**— যে শান্ত স্বভাব ; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **বীর্য**—পরাক্রম ; **দর্শনে**—বিষয়ে।

অনুবাদ

ঋষি ব্রহ্মা বললেন ঃ হে বৎস নারদ, সকলের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে (এমনকি আমার প্রতিও) তুমি এই সমস্ত প্রশ্নগুলি করেছ, কেননা তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের পরাক্রম দর্শন করে অনুপ্রাণিত হয়েছি।

তাৎপর্য

নারদমুনি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে ব্রহ্মাজী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, কেননা কেউ যখন ভক্তদের সর্বশক্তিমান ভগবান সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন তখন তাঁরা অত্যন্ত উৎসাহিত হন। সেইটি শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ। ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ সম্বন্ধীয় এই প্রকার আলোচনা, যেখানে হয় সেখানে পরিবেশকে পবিত্র করে, এবং সেই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় ভক্তরা অনুপ্রাণিত হন। এই প্রকার আলোচনায় প্রশ্নকর্তা এবং উত্তরদাতা উভয়েরই হৃদয় নির্মল হয়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা কেবল ভগবান সম্বন্ধে সবকিছু জেনেই তৃপ্ত হন তাই নয়, তাঁরা সেই বার্তা অন্যদের কাছেও প্রচার করতে উৎসুক হন, কেননা তাঁরা চান যে, ভগবানের মহিমা যেন সকলেই অবগত হতে পারে। তাই ভগবদ্ভক্তকে যখন এই সুযোগ দেওয়া হয়, তখন তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। প্রচার কার্যের এইটিই মূল ভিত্তি।

শ্লোক ১০

নানৃতং তব তচ্চাপি যথা মাং প্রব্রবীষি ভোঃ।
অবিজ্ঞায় পুরং মত্ত এতাবত্ত্বং যতোহি মে ॥ ১০ ॥

ন—না ; **অনৃতম্**—মিথ্যা ; **তব**—তোমার ; **তৎ**—তা ; **চ**—ও ; **অপি**—তুমি যেভাবে উল্লেখ করেছ ; **যথা**—এই বিষয়ে ; **মাম্**—আমার ; **প্রব্রবীষি**—যেভাবে তুমি বর্ণনা করেছ ; **ভোঃ**—হে পুত্র ; **অবিজ্ঞায়**—না জেনে ; **পরম্**—পরম ; **মত্ত**—আমার উর্ধ্বে ; **এতাবৎ**—তুমি যা কিছু বলেছ ; **ত্বম্**—তুমি ; **যতঃ**—সেই কারণে ; **হি**—নিশ্চিতভাবে ; **মে**—আমার বিষয়ে।

অনুবাদ

তুমি আমার সম্বন্ধে যা বলেছ তা মিথ্যা নয়, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ আমার থেকে পরতর পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অবগত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অবশ্যই আমার বীর্যবতী কার্যকলাপ দর্শন করে মোহিত হয়।

তাৎপর্য

'কূপমণ্ডুক-ন্যায়' অনুসারে আমরা দেখতে পাই যে কূপের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে বাস করে যে ব্যাঙ তার পক্ষে বিশাল সমুদ্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুমান করা অসম্ভব। সেই ব্যাঙ যখন বিশাল সমুদ্র সম্বন্ধে শোনে, তখন প্রথমে সে বিশ্বাসই করতে চায় না যে, সেরকম কোন সমুদ্র রয়েছে, এবং তারপর যদি কেউ তাকে বোঝায় যে, বাস্তবিকপক্ষে সেরকম কোন সমুদ্র আছে, তখন সেই ব্যাঙ তার নিজের পেট যতদূর সম্ভব ফুলিয়ে সমুদ্রের আয়তন সম্বন্ধে অনুমান করার চেষ্টা করে, এবং অবশেষে তার ক্ষুদ্র পেটটি ফেটে যায় এবং প্রকৃত সমুদ্রের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ না করেই হতভাগা ব্যাঙের মৃত্যু হয়। তেমনই, জড় বৈজ্ঞানিকেরা তাদের ব্যাঙের মতো মস্তিষ্ক এবং বৈজ্ঞানিক সাফল্যের দ্বারা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়, কিন্তু অবশেষে ঠিক সেই ব্যাঙটির মতো ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

কখনো কখনো ভৌতিক দৃষ্টিতে শক্তিশালী কোন মানুষকে, ভগবান সম্বন্ধে কিছু না জেনেই, ভগবান বা ভগবানের অবতার বলে স্বীকার করা হয়। এই প্রকার ভৌতিক মূল্যায়ন ধীরে ধীরে বাড়িয়ে ব্রহ্মা পর্যন্ত পৌঁছানো যায়, তিনি হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবেদের মধ্যে সর্বোত্তম, এবং তাঁর আয়ু জড় বৈজ্ঞানিকদের কল্পনারও অতীত। সবচাইতে প্রামাণিক ভগবদ্গীতা (৮/১৭) থেকে আমরা জানতে পারি যে, ব্রহ্মার একদিন এবং একরাত্রি আমাদের এই গ্রহের লক্ষ লক্ষ বৎসরের তুল্য। কূপমণ্ডুক এত দীর্ঘ-আয়ুর কথা অবিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু যে-ব্যক্তি গীতায় বর্ণিত সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে বিচিত্রতা সৃজনকারী এক মহান্ পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের অতীত আরও বহু ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং তাদের অধ্যক্ষ ব্রহ্মার তুলনায় এই ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা অনেক ছোট, কিন্তু তাঁরা কেউই পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ নন।

নারদজী হচ্ছেন একজন মুক্ত আত্মা। মুক্তির পর তিনি নারদ নামে পরিচিত হন ; কিন্তু মুক্তির পূর্বে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ দাসীর পুত্র। এখন প্রশ্ন হতে পারে

নারদজী কেন পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না, এবং কেন তিনি ব্রহ্মাকে পরমেশ্বর বলে মনে করেছিলেন, যদিও প্রকৃতপক্ষে তিনি তা নন। মুক্ত পুরুষেরা কখনো এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা মোহিত হন না, তা হলে নারদজী কেন একজন অল্পজ্ঞানসম্পন্ন সাধারণ মানুষের মতো এই প্রশ্নগুলি করেছিলেন ?

এই প্রকার মোহ অর্জুনেরও হয়েছিল, যদিও তিনি ছিলেন ভগবানের নিত্য পার্ষদ। অর্জুন অথবা নারদের এই প্রকার মোহ ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে উৎপন্ন হয় যাতে অন্যান্য বদ্ধ জীবেরা প্রকৃত সত্য এবং ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

নারদের মনে ব্রহ্মাজীর সর্বশক্তিমান হওয়ার যে ভ্রান্ত ধারণার উদয় হয়েছিল তা কূপমণ্ডুকদের পক্ষে একটি সুন্দর শিক্ষা, যাতে তারা ভগবান সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন না হয় (ভগবানের সঙ্গে ব্রহ্মার মতো মহান ব্যক্তিরও তুলনা করা যায় না, অতএব যে ক্ষুদ্র মানব নিজেকে ভগবান বা ভগবানের অবতার বলে জাহির করতে চায় তাদের কি কথা)!

পরমেশ্বর ভগবান সর্ব অবস্থাতেই পরম ঈশ্বর, এবং এই গ্রন্থের তাৎপর্যে বহুবার আমরা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছি যে, কোন জীব, এমনকি ব্রহ্মা পর্যন্ত, ভগবানের সমকক্ষ হওয়ার দাবী করতে পারে না। মানুষেরা যখন কোন মহান ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর পরে বীরপূজা রূপে তাকে ভগবান বলে পূজা করে, তখন তাদের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্রের মতো বহু রাজা ছিলেন কিন্তু তাদের কাউকেই শাস্ত্রে ভগবান বলে উল্লেখ করা হয়নি।

সৎ রাজা হলেই ভগবান রামচন্দ্র হওয়া যায় না, পক্ষান্তরে ভগবান হতে হলে শ্রীকৃষ্ণের মতো মহান পুরুষ হওয়া আবশ্যক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান রামচন্দ্র থেকে কম পুণ্যবান ছিলেন না, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের চরিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের থেকেও বড় নৈতিকতাবাদী। শ্রীকৃষ্ণ যখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা বলতে বলেন, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির তার প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির রামচন্দ্র বা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সমকক্ষ ছিলেন। মহাজনেরা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পুণ্যাত্মা বলেছেন, কিন্তু তাঁরা রামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করেছেন। অতএব সমস্ত পরিস্থিতিতেই ভগবানের সত্তা স্বতন্ত্র এবং তাঁর বেলায় অ্যানথ্রোপোমরফিজম্ বা তাঁর ঈশ্বরত্বে নরসুলভ গুণাবলীর ধারণা প্রয়োগ করা যায় না। ভগবান সর্ব অবস্থাতেই ভগবান, এবং কোন সাধারণ জীব কখনোই তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না।

শ্লোক ১১

যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্ ।
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ ॥ ১১ ॥

যেন—যাঁর দ্বারা ; **স্ব-রোচিষা**—তাঁর জ্যোতির দ্বারা ; **বিশ্বম্**—সমগ্র জগৎ ; **রোচিতম্**—ইতিপূর্বেই রচনা করেছেন ; **রোচয়ামি**—প্রকট করি ; **অহম্**—আমি ; **যথা**—যেমন ; **অর্কঃ**—সূর্য ; **অগ্নিঃ**—আগুন ; **যথা**—যেমন ; **সোমঃ**—চন্দ্র ; **যথা**—যেমন ; **ঋক্ষ**—আকাশ ; **গ্রহ**—প্রভাবশালী গ্রহসমূহ ; **তারকাঃ**—তারকা।

অনুবাদ

ভগবান তাঁর স্বীয় জ্যোতি (ব্রহ্মজ্যোতি) দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করার পর তাঁরই শক্তিতে সেই ভগবৎ প্রকাশিত বস্তুকে আমি পুনরায় সৃষ্টির দ্বারা প্রকাশ করি, ঠিক যেমন সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র, আকাশ, প্রভাবশালী গ্রহসমূহ, নক্ষত্র আদি প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মা নারদকে বললেন যে, সৃষ্টির বিষয়ে তিনি যে পরম সৃষ্টিকর্তা নন সে সম্বন্ধে নারদের ধারণা ঠিক। কখনো কখনো অল্পবুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে যে, ব্রহ্মা হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ অধিকর্তা ব্রহ্মার মাধ্যমে নারদমুনি সেই বিষয়টি পরিষ্কার করে দিতে চেয়েছেন। আইনের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের রায় যেমন সর্বোচ্চ, তেমনই বৈদিক জ্ঞানের ব্যাপারে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ অধিকর্তা ব্রহ্মাজীর সিদ্ধান্ত সর্বোচ্চ। পূর্ববর্তী শ্লোকে আমরা প্রতিপন্ন করেছি যে, নারদমুনি ছিলেন একজন মুক্ত আত্মা ; তাই যে সমস্ত মূর্খ মানুষ তাদের মনগড়া ভগবান সৃষ্টি করে অথবা কোন প্রতারককে ভগবান বলে মনে করে, তিনি তাদের একজন ছিলেন না। তিনি নিজেকে একজন অল্পজ্ঞ বলে উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে তিনি এমনভাবে সর্বোত্তম মহাজনের কাছে তাঁর সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন যাতে তাঁর দ্বারা তা নিরসন হওয়ার মাধ্যমে অজ্ঞ ব্যক্তিরা সৃষ্টি এবং স্রষ্টার জটিল তত্ত্ব যথাযথভাবে অবগত হতে পারে।

এই শ্লোকে ব্রহ্মাজী অল্প বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করেছেন এবং প্রতিপন্ন করেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল রশ্মিচ্ছটা কর্তৃক এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জড় জগৎ সৃষ্টি হওয়ার পর তিনি তা প্রকাশ করেন। ব্রহ্মাজী তাঁর ব্রহ্ম-সংহিতাতেও (৫/৪০) সেই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে বলেছেন—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ ব্রহ্ম নিষ্কলম্ অনন্তম্ অশেষভূতম্
গোবিন্দম্ আদি পুরুষং তমহং ভজামি ॥

'আমি পরমেশ্বর ভগবান, আদি পুরুষ, গোবিন্দের ভজনা করি, ব্রহ্মজ্যোতি নামক যাঁর অনন্ত অসীম এবং সর্বব্যাপ্ত দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা হচ্ছে বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশ এবং অবস্থা সমন্বিত অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র আদি সৃষ্টির কারণ।'

সেই বর্ণনা ভগবদ্গীতাতেও (১৪/২৭) করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মজ্যোতির উৎস *(ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্)*। বৈদিক অভিধান নিরুক্তিতে *প্রতিষ্ঠা* শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে 'যা স্থাপন করে'। অতএব ব্রহ্মজ্যোতি স্বতন্ত্র বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রহ্মজ্যোতির স্রষ্টা, যে সম্বন্ধে এই শ্লোকে বলা হয়েছে *স্ব-রোচিষা* বা ভগবানের অপ্রাকৃত দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা। এই ব্রহ্মজ্যোতি সর্বব্যাপ্ত, এবং তারই প্রভাবে সমগ্র জগৎ সৃষ্টি হয়েছে; তাই বৈদিক শ্লোকে ঘোষণা করা হয়েছে যে,সমগ্র সৃষ্টি ব্রহ্মজ্যোতি কর্তৃক প্রকাশিত *(সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম)*। তাই সমগ্র সৃষ্টির বীজ হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি, এবং সেই অন্তহীন এবং অগাধ ব্রহ্মজ্যোতির প্রতিষ্ঠা হচ্ছেন ভগবান। তাই ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির পরম কারণ *(অহং সর্বস্য প্রভবঃ)*।

আমাদের কখনো মনে করা উচিত নয় যে,ভগবান একজন কামারের মতো হাতুড়ি অথবা অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করেন। ভগবান তাঁর শক্তির দ্বারা সৃষ্টি করেন। তাঁর বহু প্রকার শক্তি রয়েছে *(পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে)*। ঠিক যেমন একটি ক্ষুদ্র বটগাছের বীজে বিশাল বটবৃক্ষ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে, তেমনই ভগবান তাঁর ব্রহ্মজ্যোতি *(স্ব-রোচিষা)* দ্বারা বিভিন্ন প্রকার বীজ উৎপন্ন করেন যা ব্রহ্মার মতো ব্যক্তি কর্তৃক জল সিঞ্চনের ফলে বিকশিত হয়। ব্রহ্মা বীজ সৃষ্টি করতে পারেন না, কিন্তু তিনি বীজকে বৃক্ষে পরিণত করতে পারেন, ঠিক যেমন একজন মালী জল সিঞ্চনের দ্বারা বাগানে তরু-লতাদের বর্ধিত করে। এখানে সূর্যের যে দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। জড় জগতে সূর্য, অগ্নি, বিদ্যুৎ, চন্দ্রের কিরণ ইত্যাদি প্রকাশের কারণ, আকাশে সমস্ত জ্যোতিষ্ক সূর্যের সৃষ্টি। সেই সূর্য ব্রহ্মজ্যোতির সৃষ্টি, এবং ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা। তাই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির পরম কারণ।

শ্লোক ১২

তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
যন্মায়য়া দুর্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্গুরুম্ ॥ ১২ ॥

তস্মৈ—তাঁকে; **নমঃ**—আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি; **ভগবতে**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **বাসুদেবায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **ধীমহি**—আমি তাঁর ধ্যান করি; **যৎ**—যাঁর; **মায়য়া**—শক্তির দ্বারা; **দুর্জয়য়া**—দুর্জয়; **মাম্**—আমাকে; **বদন্তি**—তারা বলে; **জগৎ**—জগৎ; **গুরুম্**—প্রভু।

অনুবাদ

আমি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি এবং তাঁর ধ্যান করি, যাঁর দুর্জয় মায়া অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এমনভাবে প্রভাবিত করে যে,তারা আমাকে পরম নিয়ন্তা বলে মনে করে।

তাৎপর্য

পরবর্তী শ্লোকে আরও স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হবে যে, ভগবানের মায়াশক্তি অল্পবুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষদের এমনভাবে মোহিত করে যে, তারা ব্রহ্মাজী অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করে। ব্রহ্মাজী কিন্তু এইভাবে সম্বোধিত হতে অস্বীকার করেছেন, এবং তিনি সরাসরিভাবে ভগবান বাসুদেব বা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করেছেন। তিনি ইতিপূর্বে ব্রহ্ম-সংহিতাতেও (৫/১) তাঁকে সেইভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ সচ্চিদানন্দময় তিনি অনাদির আদি, এবং সর্ব কারণের পরম কারণ। সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।'

ব্রহ্মাজী তাঁর প্রকৃত স্থিতি সম্বন্ধে অবগত, এবং তিনি জানেন অল্প বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন মানুষেরা কিভাবে ভগবানের মায়াশক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে তাদের খেয়াল খুশিমতো যাকে তাকে ভগবান বলে স্বীকার করে। ব্রহ্মাজীর মতো দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাঁর শিষ্য অথবা অধস্তন ব্যক্তিদের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবান বলে সম্বোধিত হতে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু মূর্খ মানুষেরা কুকুর, শূকর, উট এবং গদর্ভের মতো প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের দ্বারা প্রশংসিত হয়ে খুশি হয়। এই ধরনের মানুষেরা ভগবদ্ বলে সম্বোধিত হবার ফলে আনন্দিত হয় কেন, অথবা এই ধরনের মানুষদের মূর্খ তোষামোদকারীরা ভগবান বলে সম্বোধন করে কেন, তা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ১৩

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥ ১৩॥

বিলজ্জমানয়া—লজ্জিত ব্যক্তির দ্বারা; **যস্য**—যাঁর; **স্থাতুম্**—অবস্থান করার জন্য; **ঈক্ষা-পথে**—সম্মুখে; **অমুয়া**—মোহিনী শক্তির দ্বারা; **বিমোহিতাঃ**—যারা বিমোহিত; **বিকত্থন্তে**—অর্থহীন প্রজল্প করে; **মম**—এটি আমার; **অহম্**—আমি সবকিছু; **ইতি**—এইভাবে অসৎ বিষয়ে আলোচনা করে; **দুর্ধিয়**—এইভাবে মন্দ বলে বিচার করা হয়েছে।

অনুবাদ

ভগবানের মায়া শক্তি তাঁর কার্যকলাপের জন্য লজ্জাবোধ করার ফলে ভগবানের সম্মুখে আসতে পারেন না। কিন্তু যে সমস্ত জীব মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছে, তারা সর্বদাই 'আমি' এবং 'আমার' এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে সর্বক্ষণ প্রলাপ করে।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের দুর্জয় মোহিনী শক্তি বা তৃতীয়া শক্তি যা অজ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে, তা সমগ্র চেতন জগতকে মোহাচ্ছন্ন করতে পারে, কিন্তু তবুও তার ভগবানের সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা নেই। অজ্ঞান, পরমেশ্বর ভগবানের পিছনে থেকে জীবদের মোহিত করে, এবং মোহাচ্ছন্ন হওয়ার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে যে তারা অর্থহীন প্রজল্প করে। বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে অর্থহীন প্রজল্পের সমর্থন করা হয়নি, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজল্প হচ্ছে—'আমি এই, এবং এটি আমার'। ভগবদ্ বিহীন সভ্যতা এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, এবং সেই সমস্ত মানুষেরা যথাযথ ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান না থাকার ফলে কতকগুলি প্রতারককে ভগবান বলে মনে করে বা নিজেদের ভগবান বলে ঘোষণা করে মায়ামুগ্ধ জীবদের বিপথগামী করে। কিন্তু ভগবানের সম্মুখে রয়েছেন যে সমস্ত শরণাগত জীব, তাঁরা কখনোই মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হন না ; তাই তাঁরা 'আমি এই, এবং এটি আমার,' এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত। তাই তাঁরা কখনো কোন প্রতারককে ভগবান বলে স্বীকার করেন না অথবা নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করেন না। এই শ্লোকে মোহাচ্ছন্ন মানুষের পরিচয় স্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ১৪

দ্রব্যং কর্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ ॥ ১৪ ॥

দ্রব্যম্—উপাদান (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ) ; **কর্ম**— ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ; **চ**—এবং ; **কালঃ**—শাশ্বত কাল ; **চ**—ও ; **স্বভাবঃ**—প্রবৃত্তি ; **জীবঃ**— জীব ; **এব**—নিশ্চিতভাবে ; **চ**—এবং ; **বাসুদেবাৎ**—বাসুদেব থেকে ; **পরঃ**—ভিন্ন অংশ ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ ; **ন**—কখনোই না ; **চ**—ও ; **অন্যঃ**—পৃথক ; **অর্থঃ**— মূল্যবোধ ; **অস্তি**—হয় ; **তত্ত্বতঃ**—বাস্তবে।

অনুবাদ

সৃষ্টির পাঁচটি মৌলিক উপাদান বা পঞ্চ মহাভূত, কর্ম, শাশ্বত কাল, জীবের স্বভাব এবং জীব, এই সমস্তই পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের বিভিন্ন অংশ, এবং বাসুদেব থেকে এদের কোন ভিন্ন সত্তা নেই।

তাৎপর্য

এই বিস্ময়কর জগতের নির্বিশেষ অভিব্যক্তি বাসুদেবের প্রকাশ কেননা সৃষ্টির উপাদান, তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিক্রিয়া এবং সেই কর্মের ভোক্তা, এরা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা এবং অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে উদ্ভূত। তা ভগবদ্গীতায় (৭/৪-৫) প্রতিপন্ন হয়েছে। পঞ্চমহাভূত অর্থাৎ মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ, এবং জড় পরিচিতির ধারণা, বুদ্ধি এবং মন, ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি সম্ভূত। শাশ্বতকাল কর্তৃক নির্ধারিত উপরোক্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম উপাদানগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভোক্তা জীব ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির উপাঙ্গ স্বরূপ। তাদের জড় জগতে অথবা চিৎ জগতে থাকবার স্বাধীনতা রয়েছে। জড় জগতে জীব অবিদ্যার দ্বারা মোহিত থাকে, কিন্তু চিৎ জগতে মোহমুক্ত জীব তার চিন্ময় স্বরূপে অবস্থান করে। জীবকে ভগবানের তটস্থা শক্তি বলা হয়। কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই জড় উপাদান অথবা চিন্ময় বিভিন্ন অংশ পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেব থেকে স্বতন্ত্র নয়। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি সম্ভূত সবকিছুই ভগবানের জ্যোতিরই বিভিন্ন প্রকাশ, ঠিক যেমন আলোক, তাপ এবং ধূম্র অগ্নির বিভিন্ন প্রকাশ। তাদের কোনটি আগুন থেকে ভিন্ন নয়—সম্মিলিতভাবে তাদের বলা হয় আগুন ; তেমনই সমগ্র বিস্ময়কর প্রকাশ এবং বাসুদেবের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা তাঁর নির্বিশেষ অভিব্যক্তি, কিন্তু তিনি, উপরোক্ত সমস্ত জড় উপাদানগুলির ধারণার অতীত, তাঁর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ নামক চিন্ময় স্বরূপে তিনি নিত্য বিরাজমান।

শ্লোক ১৫

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণ পরা মখাঃ ॥ ১৫ ॥

নারায়ণ—পরমেশ্বর ভগবান ; **পরাঃ**—কারণস্বরূপ এবং তার নিমিত্ত ; **বেদা**— জ্ঞান ; **দেবা**—দেবতা ; **নারায়ণ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **অঙ্গজাঃ**—অঙ্গ থেকে উদ্ভূত ; **নারায়ণ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **পরাঃ**—নিমিত্ত ; **লোকাঃ**—গ্রহসমূহ ; **নারায়ণ**—পরমেশ্বর ভগবান ; **পরাঃ**—কেবল তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ; **মখাঃ**—সমস্ত যজ্ঞ।

অনুবাদ

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ কর্তৃক প্রণীত হয়েছে এবং সেগুলি তাঁরই নিমিত্ত ; সমস্ত দেবতারা তাঁরই অঙ্গ থেকে উদ্ভূত এবং তাঁরা সকলেই তাঁর সেবক ; স্বর্গ আদি বিভিন্ন লোকসমূহ তাঁরই জন্য এবং বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি বিধান করা।

তাৎপর্য

বেদান্ত সূত্র *(শাস্ত্র যোনিত্বাৎ)* অনুসারে সমস্ত শাস্ত্রের প্রণেতা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং পরমেশ্বর ভগবানকে জানবার জন্যই সমস্ত শাস্ত্র। বেদ শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবদ্

বিষয়ক জ্ঞান। বেদ প্রণয়নের উদ্দেশ্য ভগবৎ বিস্মৃত বদ্ধ জীবদের পুনরায় ভগবৎ চেতনা জাগরিত করা, এবং যে সমস্ত সাহিত্য ভগবৎ চেতনা জাগরিত করে না, নারায়ণপর ভক্তরা তা ত্যাগ করেন। যে সমস্ত গ্রন্থের লক্ষ্য নারায়ণ নন, সেই সমস্ত গ্রন্থ জ্ঞান প্রদান করে না, পক্ষান্তরে সেগুলি হচ্ছে বায়স তীর্থ বা কাকেদের বিচরণ ভূমি, যারা কেবল পৃথিবীর আবর্জনা সংগ্রহে আগ্রহী। সমস্ত গ্রন্থ (বিজ্ঞান অথবা কলা) যেন অবশ্যই নারায়ণ সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রদান করে ; তা না হলে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। জ্ঞানের উন্নতি সাধনের এইটিই হচ্ছে পন্থা। পরম আরাধ্য বিগ্রহ হচ্ছেন নারায়ণ। পূজা করার ব্যাপারে দেবতাদের গৌণ স্থান প্রদান করা হয়েছে কেননা দেবতারা হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনার ব্যাপারে নারায়ণের সহকারী। রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যেমন রাজার সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়, দেবতারাও তেমন ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার ফলে পূজিত হন। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে দেবতাদের পূজা অবৈধ *(অবিধিপূর্বকম্)*, ঠিক যেমন গাছের গোড়ায় জল না দিয়ে পাতায় এবং ডালে জল ঢালা অনুচিত। সমস্ত দেবতারা ভগবানের উপর নির্ভরশীল। স্বর্গ আদি বিভিন্ন লোক আকর্ষণীয় বলে মনে হয় কেননা তাতে বিভিন্ন রকম জীবন এবং আনন্দ রয়েছে, যা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের আংশিক অভিব্যক্তি। সকলেই চায় আনন্দ এবং জ্ঞানময় শাশ্বত জীবন। জড় জগতে এই প্রকার আনন্দ এবং জ্ঞানময় শাশ্বত জীবন ক্রমান্বয়ে উচ্চতর লোকে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরে ভগবদ্ধামে যাওয়ার বাসনা উদিত হয়। উচ্চ থেকে উচ্চতর লোকে জ্ঞান এবং আনন্দ সমন্বিত জীবনের দৈর্ঘ্য অধিক থেকে অধিকতর বর্ধিত হতে পারে। বিভিন্ন গ্রহলোকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বৎসর পর্যন্ত আয়ু লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু কোথাও নিত্য জীবন লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সর্বোচ্চ লোক, ব্রহ্মলোকে পৌঁছনোর পর চিৎ জগতে প্রবেশ করার আকাঙ্ক্ষা হতে পারে, যেখানে জীবন নিত্য। তাই এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহে উন্নীত হওয়ার যাত্রার সমাপ্তি হয় ভগবদ্ধামে *(মদ্ধাম)* পৌঁছানোর পর, যেখানে জীবন নিত্য জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাঁর সন্তুষ্টি বিধান করা, এবং এই কলিযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ যা নারায়ণপর ভক্তদের ভক্তির মূল আধার।

শ্লোক ১৬

নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ ॥ ১৬ ॥

নারায়ণ পরঃ—কেবল নারায়ণকে জানবার জন্য ; **যোগঃ**—মনের একাগ্রতা ; **নারায়ণ-পরম্**—নারায়ণকে প্রাপ্ত হওয়া উদ্দেশ্যে ; **তপঃ**—তপস্যা ; **নারায়ণ-পরম্**—পলকের জন্য নারায়ণের দর্শন পাওয়ার জন্য ; **জ্ঞানম্**—দিব্য জ্ঞানের সংস্কৃতি ;

নারায়ণ-পরা—নারায়ণের ধামে প্রবেশ করার ফলে মোক্ষের পথ সমাপ্ত হয় ; **গতিঃ**—প্রগতির পন্থা।

অনুবাদ

সর্বপ্রকার ধ্যান এবং যোগ হচ্ছে নারায়ণকে জানবার বিভিন্ন উপায়, সর্বপ্রকার তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণকে প্রাপ্ত হওয়া। দিব্য জ্ঞানের সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে নারায়ণের দর্শন লাভ করা এবং মুক্তির চরম অবস্থা হচ্ছে নারায়ণের ধামে প্রবেশ করা।

তাৎপর্য

ধ্যানের দুটি পদ্ধতি রয়েছে, যথা অষ্টাঙ্গ যোগ এবং সাংখ্যযোগ। অষ্টাঙ্গযোগ ধ্যান, ধারণ, আসন, প্রাণায়াম ইত্যাদির মাধ্যমে মনকে একাগ্র করার অভ্যাস। আর সাংখ্য যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎ এবং অসৎ এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা। কিন্তু চরমে উভয় পদ্ধতিরই লক্ষ্য হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভূতি, যা পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের আংশিক অভিব্যক্তি। পূর্বেই আমরা বিশ্লেষণ করেছি যে, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি পরমেশ্বর ভগবানের অংশমাত্র। নির্বিশেষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবানে প্রতিষ্ঠিত, এবং ব্রহ্ম হচ্ছে ভগবানের মহিমা কীর্তন। সেকথা ভগবদ্গীতা এবং মৎস্য পুরাণে প্রতিপন্ন হয়েছে। *গতি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে চরম লক্ষ্য বা মুক্তির চরম অবস্থা। নির্বিশেষ ব্রহ্ম-জ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া চরম মুক্তি নয় ; তার থেকেও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে অনন্ত বৈকুণ্ঠ লোকের কোন একটি লোকে পরমেশ্বর ভগবানের পরম আনন্দময় সঙ্গ লাভ করা। অতএব পারমার্থিক দর্শনের চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে, নারায়ণ বা পরমেশ্বর ভগবান সর্বপ্রকার যোগ পদ্ধতি এবং সর্বপ্রকার মুক্তির চরম লক্ষ্য।

শ্লোক ১৭

তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ।
সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ ॥ ১৭ ॥

তস্য—তার ; **অপি**—নিশ্চিতভাবে ; **দ্রষ্টুঃ**—দ্রষ্টার ; **ঈশস্য**—নিয়ন্তার ; **কূটস্থস্য**—যিনি সকলের বুদ্ধিমত্তার অতীত ; **অখিল-আত্মনঃ**—পরমাত্মার ; **সৃজ্যম্**—পূর্বেই যার সৃষ্টি হয়েছে ; **সৃজামি**—আমি আবিষ্কার করি ; **সৃষ্টঃ**—সৃষ্ট ; **অহম্**—আমি ; **ঈক্ষয়া**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা ; **এব**—সঠিক ; **অভিচোদিতঃ**—তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে।

অনুবাদ

তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মারূপ তাঁর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে তিনি পূর্বেই যা সৃষ্টি করেছেন আমি কেবল তা পুনঃপ্রকাশ করি। এমনকি আমিও তাঁরই সৃষ্টি।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও স্বীকার করেন যে, তিনি প্রকৃত স্রষ্টা নন, পক্ষান্তরে নারায়ণ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে পূর্বেই তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তা সৃজন করেন। আত্মার দুই স্বরূপ, পরমাত্মা এবং জীবাত্মা, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন স্বীকার করেছেন। পরমাত্মা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, আর জীবাত্মা ভগবানের নিত্য সেবক। ভগবান জীবাত্মাকে পূর্বেই তিনি যা নির্মাণ করেছেন তা সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত করেন, এবং ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে এই জগতে কেউ যখন কোন কিছু আবিষ্কার করে, তখন তাকে আবিষ্কর্তা রূপে কৃতিত্ব দেওয়া হয়। কলোম্বাসকে পশ্চিম গোলার্ধ সৃষ্টি করার কৃতিত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কলোম্বাস তা সৃষ্টি করেনি। পরমেশ্বর ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে সেই বিশাল ভূখণ্ড পূর্বেই সেখানে ছিল, আর কলোম্বাস তা পূর্বকৃত সুকৃতির প্রভাবে ভগবান কর্তৃক আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে আমেরিকা আবিষ্কার করার কৃতিত্ব অর্জন করে। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কেউই কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, যেহেতু সকলেই তার ক্ষমতা অনুসারে দর্শন করে। সেই ক্ষমতাও জীবের ভগবানকে সেবা করার বাসনা অনুসারে ভগবান দান করে থাকেন। তাই সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের সেবা করা এবং তার ফলে ভগবান তার চরণে সেই সেবকের শরণাগতি অনুসারে শক্তি প্রদান করবেন। ব্রহ্মা হচ্ছেন ভগবানের মহান্ ভক্ত ; তাই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে ভগবান তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছেন বা শক্তি প্রদান করেছেন। ভগবান অর্জুনকেও কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করে বলেছেন—

তস্মাৎ ত্বম্ উত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বম্ এব
নিমিত্ত-মাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ (গীঃ ১১/৩৩)

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই হোক,কিংবা যে কোন স্থানে, বা যে কোন সময়ে অন্য যে কোন যুদ্ধই হোক, তা ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সংঘটিত হয়, কেননা ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কখনো এত বড় জনসংহার কেউই আয়োজন করতে পারে না। দুর্যোধনের গোষ্ঠী শ্রীকৃষ্ণের মহান্ ভক্ত দ্রৌপদীকে অপমান করেছিল, এবং দ্রৌপদী তখন ভগবান তথা সেখানে উপস্থিত সমস্ত নীরব দর্শকদের এই অযাচিত অপমানের প্রতিবাদ করার জন্য আবেদন করেছিলেন, সেই জন্যই ভগবান কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন, এবং অর্জুনকে যুদ্ধ করে যুদ্ধজয়ের কৃতিত্ব অর্জন করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে দুর্যোধন এবং তার অনুগামীরা এমনিতেই নিহত হত। তাই তিনি তাঁর আজ্ঞাবহ রূপে ভীষ্ম, কর্ণ প্রমুখ মহান্ সেনানায়কদের সংহার করার কৃতিত্ব অর্জন করার জন্য অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

কঠ উপনিষদ আদি বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানকে সর্বভূত অন্তরাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি সকলের শরীরে বিরাজ করেন এবং যারা তাঁর শরণাগত, তাদের তিনি পরিচালনা করেন। যারা ভগবানের শরণাগত নয়, তাদের জড়া প্রকৃতির তত্ত্বাবধানে রাখা হয় *(ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া)*; তাই, তাদের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করতে দেওয়া হয় এবং তার ফলে তারা তার ফল ভোগ করে। ব্রহ্মা, অর্জুন প্রমুখ ভক্তরা কখনো তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে কোন কিছু করেন না। তাঁরা সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত আত্মা, এবং সর্বদাই তাঁরা ভগবানের নির্দেশের অপেক্ষা করেন; তাই তাঁরা এমন কিছু করার প্রয়াস করেন যা সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলে প্রতীত হয়।

ভগবানের একটি নাম হচ্ছে উরুক্রম, যার অর্থ হচ্ছে যাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত অদ্ভুত এবং জীবের কল্পনার অতীত। তাই ভগবানের ভক্তের কার্যকলাপও কখনো কখনো অত্যন্ত অদ্ভুত বলে মনে হয়, কেননা তার পিছনে ভগবানের নির্দেশনা থাকে।

ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব ব্রহ্মা থেকে শুরু করে একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত প্রতিটি জীবের বুদ্ধিমত্তার তত্ত্বাবধান ভগবান করেন, এবং অপ্রাকৃত স্তর থেকে তিনি তাদের সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষী থাকেন। যে সমস্ত বুদ্ধিমান মানুষেরা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রভাবে চিন্তা, অনুভব এবং ইচ্ছার প্রভাব অধ্যয়ন করতে পারেন, তাঁরা ভগবানের সূক্ষ্ম উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন।

শ্লোক ১৮

সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ।
স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ ॥ ১৮ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **ইতি**—এই সমস্ত; **নির্গুণস্য**—গুণাতীত চিন্ময় বস্তুর; **গুণাঃ-ত্রয়ঃ**—তিনটি গুণ; **স্থিতি**—পালন; **সর্গ**—সৃষ্টি; **নিরোধেষু**—ধ্বংস; **গৃহীতাঃ**—স্বীকৃত; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা; **বিভোঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপ শুদ্ধ চিন্ময় এবং তা সমস্ত জড় গুণের অতীত, তথাপি জড় জগতের সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংসের জন্য তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে সত্ত্ব, রজো এবং তমো নামক প্রকৃতির তিনটি গুণ স্বীকার করেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান সত্ত্ব, রজো এবং তমো, এই ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা শক্তির প্রভু, এবং এই শক্তির প্রভু রূপে তিনি কখনো এই মোহিনী শক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হন না। জীবেরা কিন্তু জড়া প্রকৃতির এই গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয় অথবা প্রভাবিত হওয়ার

প্রবণতা থাকে—এইটি হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে জীবের পার্থক্য, জীব যদিও গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, তথাপি জীব প্রকৃতির এই গুণগুলির অধীন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, জড়া প্রকৃতির গুণগুলি ভগবানের শক্তিসম্ভূত হওয়ার ফলে অবশ্যই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত, তবে সেই সম্পর্কটি ঠিক প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মতো। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা, কিন্তু জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ জীব প্রভু নয় অথবা নিয়ন্তাও নয়। পক্ষান্তরে তারা প্রকৃতির অধীন অথবা প্রকৃতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতপক্ষে ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি বা চিৎশক্তির প্রভাবে নিত্য প্রকাশিত, ঠিক মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য বা সূর্য কিরণের মতো, কিন্তু সূর্য যেমন আকাশে মেঘ সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনই ভগবান জড়া প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেন। সূর্য যেমন কখনোই মেঘের দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তেমনই অনন্ত ভগবানও তাঁর অসীম ব্রহ্মজ্যোতিতে সাময়িকভাবে প্রকাশিত নগণ্য জড়া শক্তির দ্বারা কখনো প্রভাবিত হন না।

শ্লোক ১৯

কার্যকারণকর্তৃত্বে দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়াঃ।
বধ্নন্তি নিত্যদা মুক্তং মায়িনং পুরুষং গুণাঃ ॥ ১৯ ॥

কার্য—কার্য; **কারণ**—কারণ; **কর্তৃত্বে**—কর্তৃত্বে; **দ্রব্য**—জড় পদার্থ; **জ্ঞান**— জ্ঞান; **ক্রিয়াশ্রয়াঃ**—এই প্রকার লক্ষণের দ্বারা প্রকাশিত; **বধ্নন্তি**—আবদ্ধ করে; **নিত্যদা**—নিত্য; **মুক্তম্**—চিন্ময়; **মায়িনম্**—জড়া প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারা; **পুরুষম্**—জীব; **গুণাঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ।

অনুবাদ

প্রকৃতির এই তিনটি গুণ দ্রব্য, জ্ঞান এবং ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হয়ে নিত্য শাশ্বত জীবকে তার সমস্ত কার্যকলাপের জন্য দায়ী করে তাকে কার্য এবং কারণের বন্ধনে আবদ্ধ করে।

তাৎপর্য

ভগবানের অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যবর্তী হওয়ার ফলে নিত্য শাশ্বত জীবকে ভগবানের তটস্থা শক্তি বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে, জীবের জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা নয়, কিন্তু জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার ভ্রান্ত অভিমানের ফলে সে এই শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ভগবানের এই বহিরঙ্গা শক্তি ভগবানের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্পর্কের বিশুদ্ধ জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে, এবং এই আবরণ এতই গভীর যে,মনে হয় যেন বদ্ধ জীব চিরকাল অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার প্রভাব এমনই অদ্ভুত যে, মনে হয় যেন জড় জগৎ থেকে সবকিছু উদ্ভূত হয়েছে। জড়া প্রকৃতির আবরণাত্মিকা

শক্তির প্রভাবে জড় বৈজ্ঞানিকেরা জড়জাগতিক কারণের ঊর্ধ্বে দর্শন করতে পারে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জড় জগতের প্রকাশের পিছনে রয়েছে অধিভূত, অধ্যাত্ম এবং অধিদৈব ক্রিয়া যা তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন বদ্ধ জীবেরা দর্শন করতে পারে না। অধিভূত প্রকাশের ফলে জরা এবং ব্যাধি সমন্বিত জন্ম ও মৃত্যুর চক্রে জীব আবর্তিত হয়, অধ্যাত্ম প্রকাশের ফলে চিন্ময় আত্মা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এবং অধিদৈব প্রকাশের ফলে জীব প্রকৃতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। এইগুলি জড় জগতে আবদ্ধ অভিনেতার কার্য, কারণ এবং কর্তৃত্বের প্রকাশ। এগুলি বদ্ধ অবস্থার অভিব্যক্তি, এবং যে বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই জীবের সর্বোত্তম প্রাপ্তি।

শ্লোক ২০

স এষ ভগবাল্লিঙ্গৈস্ত্রিভিরেতৈরধোক্ষজঃ।
স্বলক্ষিত গতির্ব্রহ্মন্ সর্বেষাং মম চেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥

সঃ—তিনি ; এষ—এই ; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান ; **লিঙ্গৈঃ**—লক্ষণের দ্বারা ; **ত্রিভিঃ**—তিন প্রকার ; **এতৈঃ**—এই সবকিছুর দ্বারা ; **অধোক্ষজঃ**—ইন্দ্রিয় উপলব্ধির অতীত পরম দ্রষ্টা ; **সু-অলক্ষিত**—বিশেষরূপে অগোচর ; **গতিঃ**—গতিবিধি ; **ব্রহ্মন্**—হে নারদ ; **সর্বেষাম্**—সকলের ; **মম**—আমার ; **চ**—ও ; **ঈশ্বরঃ**—নিয়ন্তা।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ নারদ ! সেই পরম দ্রষ্টা পরমেশ্বর ভগবান প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত বদ্ধ জীবের জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর। তিনি সকলের, এমনকি আমারও নিয়ন্তা।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/২৪-২৫) ভগবান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেনযে, যারা ব্রহ্মজ্যোতির উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং মনে করে যে চরমে পরম সত্য নির্বিশেষ এবং তা প্রয়োজনের বশেই কেবল রূপ পরিগ্রহ করে, তারা সবিশেষবাদীদের তুলনায় অত্যন্ত মূর্খ। এই সমস্ত নির্বিশেষবাদীরা যতই বেদান্ত পাঠ করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তারা জড়া প্রকৃতির উল্লিখিত তিনটি গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত ; তাই তারা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সান্নিধ্য লাভে অক্ষম। যে কেউ ভগবানের কাছে যেতে পারে না কেননা তিনি তাঁর যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত। কিন্তু ভ্রান্তিবশত কারোরই মনে করা উচিত নয় যে,ভগবান পূর্বে অব্যক্ত ছিলেন এবং সম্প্রতি নররূপে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ভগবানের নিরাকার হওয়ার ভ্রান্ত ধারণা ভগবানকে আবৃত করে যে যোগমায়ার যবনিকা তারই প্রভাব, এবং বদ্ধ জীব যখন ভগবানের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে, তখন ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে সেই আবরণ উন্মোচিত হয়। ভগবানের যে সমস্ত

ভক্ত উল্লিখিত জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অতীত, তারা শুদ্ধভক্তি যোগে প্রেমপূর্ণ দৃষ্টিতে ভগবানের নিত্য আনন্দময় অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করতে পারেন।

শ্লোক ২১

কালং কর্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে ॥ ২১ ॥

কালম্—নিত্যকাল; **কর্ম**—জীবের অদৃষ্ট; **স্বভাবম্**—প্রকৃতি; **চ**—ও; **মায়া**—শক্তি; **ঈশঃ**—নিয়ন্তা; **মায়য়া**—শক্তির দ্বারা; **স্বয়া**—তাঁর নিজের; **আত্মন্**—(আত্মনি)নিজেকে; **যদৃচ্ছয়া**—স্বতন্ত্রভাবে; **প্রাপ্তম্**—অবস্থিত হয়ে; **বিবুভূষুঃ**—ভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়ে; **উপাদদে**—পুনরায় সৃষ্ট হওয়ার জন্য গৃহীত।

অনুবাদ

সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা ভগবান, তাঁর শক্তির দ্বারা নিত্যকাল, সমস্ত জীবের অদৃষ্ট এবং তাদের স্বভাব সৃষ্টি করেন, এবং তিনি পুনরায় স্বতন্ত্রভাবে তাদের নিজের মধ্যে বিলীন করে দেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎ, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান বদ্ধ জীবদের তাঁর অধীনে রেখে কর্ম করতে দেন, পুনঃ পুনঃ প্রলয়ের পর তার সৃষ্টি হয়। জড় সৃষ্টি অন্তহীন আকাশে একখণ্ড মেঘের মতো। প্রকৃত আকাশ হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতির কিরণে নিত্য পূর্ণ চিদাকাশ। এই অন্তহীন আকাশের একটি অংশ জড় সৃষ্টিরূপী মহত্তত্ত্বের মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত, যেখানে ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আধিপত্য করতে অভিলাষী বদ্ধ জীবেরা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে তাদের বাসনা অনুসারে আচরণ করার জন্য প্রক্ষিপ্ত হয়। ঠিক যেমন নিয়মিতভাবে বর্ষাঋতুর আগমন এবং অন্তর্ধান হয়, ঠিক তেমন ভগবানের নিয়ন্ত্রণে জড় জগতের সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়। সে কথা ভগবদ্গীতায় (৮/১৯) প্রতিপন্ন হয়েছে। এইভাবে জড় জগতের সৃষ্টি এবং প্রলয় ভগবানের নিয়মিত কার্য, যার মাধ্যমে জীবের নিজ ইচ্ছা অনুসারে আচরণ পূর্বক আপন ভাগ্য রচনা করে প্রলয়ের সময় স্বতন্ত্র ইচ্ছা অনুসারে জন্মগ্রহণ করতে দেওয়া হয়। এইভাবে, কোন এক ঐতিহাসিক সময়ে সৃষ্টি হয় (আমাদের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা অনুসারে আমরা মনে করি যে সব কিছুরই আদি রয়েছে)। সৃষ্টি এবং প্রলয়ের প্রক্রিয়াকে বলা হয় অনাদি। তার যে কখন প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই, কেননা আংশিক সৃষ্টিরও স্থিতি হচ্ছে ৮,৬৪,০০,০০,০০০ বৎসর। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত সৃষ্টির নিয়ম হচ্ছে যে, তা ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে কিছু সময়ের পর পুনরায় ধ্বংস হয়ে যায়। সমগ্র জড় সৃষ্টি এমনকি চিন্ময় জগতও ভগবানের শক্তির প্রকাশ, ঠিক

যেমন তাপ এবং আলো আগুনের শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। ভগবান তাই তাঁর শক্তির বিস্তারের মাধ্যমে নির্বিশেষ রূপে বিরাজ করেন এবং সমগ্র সৃষ্টি তাঁর নির্বিশেষ রূপের আশ্রয়ে অবস্থিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গৌণরূপে নিজেকে পৃথক রাখেন। তাই ভ্রান্তভাবে কখনো মনে করা উচিত নয় যে,তাঁর অন্তহীন নির্বিশেষ প্রকাশ রয়েছে বলে তাঁর সবিশেষ রূপ নেই। তাঁর নির্বিশেষ রূপ তাঁর শক্তির প্রকাশ, এবং তাঁর অন্তহীন নির্বিশেষ শক্তিতে নিজেকে বিস্তার করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সবিশেষ রূপে নিত্য বিরাজমান *(ভগবদ্গীতা ৯/৫-৭)*। সমগ্র সৃষ্টি যে কিভাবে ভগবানের শক্তির আশ্রয়ে বর্তমান তা ধারণা করা ক্ষুদ্র বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের পক্ষে দুষ্কর, কিন্তু সে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় ভগবান একটি অত্যন্ত সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, বায়ু এবং পরমাণু সমস্ত জড় সৃষ্টির বিশাল আকাশের আধার-স্বরূপ আশ্রিত হলেও আকাশ তার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বতন্ত্র ও অবিকৃত থাকে, তেমনই ভগবান তাঁর শক্তির দ্বারা সৃষ্ট সবকিছুর আশ্রয় হলেও সর্বদা তাদের থেকে স্বতন্ত্র থাকেন। নির্বিশেষবাদীর মহান্ সমর্থক শঙ্করাচার্য সে কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন *নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ* অর্থাৎ নারায়ণ তাঁর নির্বিশেষ সৃষ্টি শক্তির অতীত। সেইভাবে প্রলয়ের সময় সমগ্র সৃষ্টি নারায়ণের দিব্য শরীরে লীন হয়ে যায়, এবং সৃষ্টির সময় পুনরায় অদৃষ্ট এবং স্বতন্ত্র স্বভাব নিয়ে তাঁর শরীর থেকে সৃষ্টির উদ্ভব হয়। ভগবানের অংশ হওয়ার ফলে সেই জীবদের কখনো কখনো আত্মা বলে বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ গুণগতভাবে জীবও চিন্ময়। কিন্তু জড় সৃষ্টি কর্তৃক সক্রিয়ভাবে এবং অধ্যাত্ম রুচিগতভাবে আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা থাকার ফলে জীব ভগবান থেকে ভিন্ন।

শ্লোক ২২

কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ॥ ২২॥

কালাৎ—নিত্যকাল থেকে; **গুণব্যতিকরঃ**—প্রতিক্রিয়ার দ্বারা গুণের রূপান্তর; **পরিণামঃ**—রূপান্তর; **স্বভাবতঃ**—স্বভাব থেকে; **কর্মণঃ**—কর্মের; **জন্ম**—সৃষ্টি; **মহতঃ**—মহত্তত্ত্বের; **পুরুষাধিষ্ঠিতাৎ**—ভগবানের পুরুষাবতারের কারণ; **অভূৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

প্রথম পুরুষাবতারের (কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু) পর মহত্তত্ত্ব বা জড় সৃষ্টির তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তারপর কাল প্রকট হয়, এবং কালক্রমে তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়। প্রকৃতির অর্থ হচ্ছে তিনটি গুণের অভিব্যক্তি। সেগুলি কার্যে রূপান্তরিত হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবানের সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে রূপান্তর এবং প্রতিক্রিয়ার পন্থায় ক্রমে ক্রমে সমগ্র জগৎ প্রকাশিত হয়, এবং তার সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে ভগবান পুনরায় তাঁর দেহে তা সংবরণ করে নেন। কাল, সমস্ত প্রকৃতিরই অপর সংজ্ঞা এবং তা জড় সৃষ্টির মূল উপাদান মহৎ তত্ত্বেরই বিকার। সেই সূত্রে কালকে সমগ্র সৃষ্টির প্রথম কারণ বলে মনে করা যেতে পারে, এবং প্রকৃতির রূপান্তরের ফলে জড় জগতে বিভিন্ন কার্যকলাপ দৃষ্টিগোচর হয়। এই সমস্ত কার্যকলাপ জীবের অথবা জড় পদার্থের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বলে মনে করা যেতে পারে, এবং কর্মের প্রকাশের পর জীবের স্বভাব থেকে বিভিন্ন প্রকার ফল প্রকাশ হতে দেখা যায়। মূলত পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন এই সবকিছুর কারণ। তাই বেদান্ত সূত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবত পরম সত্যকে সমস্ত সৃষ্টির মূল বলে সর্বপ্রথমে ঘোষণা করেছে (*জন্মাদস্য যতঃ*)।

শ্লোক ২৩

মহতস্তু বিকুর্বাণাদ্রজঃসত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।
তমঃ প্রধানস্ত্বভবদ্ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ॥ ২৩ ॥

মহতঃ—মহত্তত্ত্বের ; **তু**—কিন্তু ; **বিকুর্বাণাৎ**—রূপান্তরিত হয়ে ; **রজঃ**—প্রকৃতির রজোগুণ ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বগুণ ; **উপবৃংহিতাৎ**—বর্ধিত হওয়ার ফলে ; **তমঃ**—তমোগুণ ; **প্রধান ঃ**—প্রাধান্য ; **তু**—কিন্তু ; **অভবৎ**—হয়েছিল ; **দ্রব্য**—পদার্থ ; **জ্ঞান**—জড় জ্ঞান ; **ক্রিয়াত্মকঃ**—প্রধানত জড়জাগতিক কার্যকলাপ।

অনুবাদ

মহত্তত্ত্ব বিক্ষুব্ধ হওয়ার ফলে জড় কার্যকলাপের উদ্ভব হয়। প্রথমে সত্ত্বগুণ এবং রজোগুণের রূপান্তর হয় এবং তারপর তমোগুণের প্রভাবে দ্রব্য, জ্ঞান এবং ক্রিয়াশক্তির উদ্ভব হয়।

তাৎপর্য

সব রকম জড় সৃষ্টি কমবেশি রজোগুণের বিকার থেকেই হয়। মহত্তত্ত্ব জড় সৃষ্টির মূল কারণ, এবং তা যখন ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয়, তখন সর্বপ্রথমে রজো এবং সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়। তারপর বিভিন্ন প্রকার জড়জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা উৎপন্ন রজোগুণ প্রাধান্য লাভ করে, এবং এইভাবে জীবেরা কমবেশি তমোগুণে লিপ্ত হয়। ব্রহ্মা রজোগুণের প্রতিনিধি, বিষ্ণু সত্ত্বগুণের প্রতিনিধি, এবং জড় কার্যকলাপের জনক শিব তমোগুণের প্রতিনিধি। জড়া প্রকৃতিকে বলা হয় মাতা এবং জড়জাগতিক জীবনের প্রবর্তক শিব হচ্ছেন পিতা।

এইভাবে জীব কর্তৃক জড় সৃষ্টির প্রবর্তন হয় রজোগুণ থেকে। কোন বিশেষ যুগে জীবনের প্রগতির ফলে বিভিন্ন গুণের ক্রমবিকাশ হয়। কলিযুগে (যাতে রজোগুণের প্রভাব সবচাইতে অধিক) মানব সভ্যতার প্রগতির নামে নানা প্রকার জড় কার্যকলাপের আচরণ হয়, এবং জীব তার চিন্ময় স্বরূপ ক্রমেই বিস্মৃত হয়।

কিন্তু এই যুগে সত্ত্বগুণের স্বল্প অনুশীলনের ফলে চিৎজগৎ দর্শন করা যায়, কিন্তু রজোগুণের প্রাধান্যের ফলে সত্ত্বগুণ অপমিশ্রিত হয়। তাই জীবের পক্ষে প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করা সম্ভব হয় না, এবং বিভিন্ন ভাবে সত্ত্বগুণের অনুশীলন করার ফলে সমস্ত গুণের অতীত পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা জীবের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ স্থূল জড় পদার্থ হচ্ছে *অধিভূতম্*, তাদের পালন *অধিদৈবম্*, এবং জড় কার্যকলাপের প্রবর্তক হচ্ছে *অধ্যাত্মম্*। জড় জগতের প্রধান অবয়ব হচ্ছে এই তিনটি তত্ত্ব, যথা উপাদান সামগ্রী, তার নিয়মিত সরবরাহ, এবং মোহগ্রস্ত জীবের ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য নানা বৈচিত্র্যে তার ব্যবহার।

শ্লোক ২৪

সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্বণ্ সমভূৎত্রিধা।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতি যদ্ভিদা।
দ্রব্যশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিরিতি প্রভো ॥ ২৪ ॥

সঃ—সেই বস্তু; **অহঙ্কারঃ**—অহঙ্কার; **ইতি**—এইভাবে; **প্রোক্তঃ**—বলা হয়; **বিকুর্বণ্**—রূপান্তরিত হয়ে; **সমভূৎ**—প্রকাশিত হয়ে; **ত্রিধা**—তিনরূপে; **বৈকারিকঃ**—সত্ত্বগুণে; **তৈজসঃ**—রজোগুণে; **চ**—এবং; **তামসঃ**—তমোগুণে; **চ**—ও; **ইতি**—এইভাবে; **যৎ**—যা হয়; **ভিদা**—বিভক্ত; **দ্রব্যশক্তিঃ**—পদার্থকে বিকশিত করার শক্তি; **ক্রিয়াশক্তিঃ**—সৃষ্টির প্রেরণা; **জ্ঞানশক্তিঃ**—পথ প্রদর্শনকারী বুদ্ধিমত্তা; **ইতি**—এইভাবে; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

আত্মকেন্দ্রিক অহঙ্কার তিন রূপে রূপান্তরিত হয়ে বৈকারিক, তৈজস এবং তামস অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার, রাজস অহঙ্কার ও তামস অহঙ্কার এই তিন প্রকারে উদ্ভূত হয়। তামস অহঙ্কার থেকে দ্রব্য শক্তি, রাজস অহঙ্কার থেকে ক্রিয়া শক্তি এবং সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে জ্ঞানশক্তি প্রকাশ হয়। হে নারদ, তুমি তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম।

তাৎপর্য

অহঙ্কার, বা জড় পদার্থে নিজের পরিচিতি স্থাপন করার প্রবণতা প্রবলভাবে আত্মকেন্দ্রিক, এবং ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় স্পষ্ট জ্ঞান রহিত। জড় বিষয়াসক্ত বদ্ধ জীবের এই আত্মকেন্দ্রিক অহঙ্কার জগতের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের দ্বারা জীবের বদ্ধ

হওয়ার কারণ। ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ে (শ্লোক ২৪-২৭) অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেই আত্মকেন্দ্রিক অহঙ্কারের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান রহিত, আত্মকেন্দ্রিক নির্বিশেষবাদী, সিদ্ধান্ত করে যে পরমেশ্বর ভগবান কোন বিশেষ কার্য সাধনের জন্য তার স্বরূপগত নির্বিশেষ চিন্ময় রূপ থেকে জড় রূপ পরিগ্রহ করেন। এবং এই সমস্ত আত্মকেন্দ্রিক নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মসূত্র এবং জ্ঞানের অতি উন্নত আধার স্বরূপ বৈদিক শাস্ত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহী হলেও পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। ভগবানের সবিশেষ স্বরূপ সম্বন্ধে তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের মিশ্রণ থেকে উদ্ভূত অজ্ঞানেরই প্রকাশ। তাই নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের সচ্চিদানন্দ রূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে ভগবান অভক্তদের কাছে তাঁর নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন না, এবং তাই তারা ভগবদ্গীতা আদি পাঠ করা সত্ত্বেও তাদের জেদীভাবের ফলে নির্বিশেষবাদী থেকে যায়। ভগবানের স্বীয়শক্তি যোগমায়ার প্রভাবে এই প্রকার জেদ প্রকাশ পায়। যোগমায়া হচ্ছেন ভগবানের সহকারী যিনি জেদী নির্বিশেষবাদীদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রাখেন। এই প্রকার মোহাচ্ছন্ন মানুষদের বলা হয় মূঢ়, কেননা তারা ভগবানের অজ এবং অপরিবর্তনীয় দিব্য রূপ উপলব্ধি করতে অক্ষম।

ভগবান যদি তাঁর মূল নির্বিশেষ রূপ থেকে জড় রূপ ধারণ করতেন, তাহলে তার অর্থ হত যে তাঁর জন্ম হয় এবং তিনি নির্বিশেষ থেকে সবিশেষে রূপান্তরিত হন। কিন্তু তিনি অপরিবর্তনীয়। এবং তিনি বদ্ধ জীবেদের মতো কখনো জন্মগ্রহণ করেন না। বদ্ধ জীব জড় জগতে তার বদ্ধ অবস্থার ফলে একদেহ থেকে আর এক দেহে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক নির্বিশেষবাদীরা তাদের গভীর অজ্ঞানের ফলে, তথাকথিত বেদান্ত দর্শনে পারদর্শী হওয়া সত্ত্বেও মনে করে যে ভগবানও তাদের মতো একজন। প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান এই সমস্ত জীবদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রবৃত্তি সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত, কিন্তু মোহাচ্ছন্ন বদ্ধ জীব তার শাশ্বত স্বরূপে তাকে কদাচিৎ উপলব্ধি করতে পারে। তাই, ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে, নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত জড় সৃষ্টির অতীত তাঁর নিত্য শাশ্বত নারায়ণ স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে।

জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা কৃত্রিমভাবে ক্রমবর্ধমান জড়জাগতিক চাহিদাগুলি মেটাবার ব্যাপারে নিরন্তর ব্যস্ত থাকে বলে তারা এই প্রকার গভীর অজ্ঞানে আচ্ছন্ন থাকে। পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে হলে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের দ্বারা জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ করতে হবে। বৈদিক শাস্ত্রে যে সত্ত্বগুণ বা ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুশীলন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সহায়ক, এবং তাই বদ্ধ জীবের জ্ঞানশক্তির স্তর, দ্রব্যশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি থেকে তুলনামূলকভাবে শ্রেষ্ঠ। জড় পদার্থের বিশাল সংগ্রহের মাধ্যমে জড় সভ্যতার প্রকাশ হয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে বিরাট বিরাট কলকারখানা এবং সেখানে উৎপাদনের জন্য যে উপাদান সরবরাহ

হয় (ক্রিয়াশক্তি) তার কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে জীবের গভীর অজ্ঞতা। দ্রব্য শক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি ভিত্তিক জড় সভ্যতার বিড়ম্বনা সংশোধন করতে হলে কর্মযোগের ভিত্তিতে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবার পন্থা অবলম্বন করতে হবে। সে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (৯/২৭) বলা হয়েছে—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥

"হে কুন্তীপুত্র! তুমি যা কিছু করো, যা খাও, যজ্ঞে যা নিবেদন করো, দান করো, এবং তপস্যা করো, তা সবই তুমি আমাকে অর্পণ কর।"

শ্লোক ২৫

তামসাদপি ভূতাদের্বিকুর্বাণাদভূন্নভঃ।
তস্য মাত্রা গুণঃ শব্দো লিঙ্গং যদ্‌দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ॥ ২৫ ॥

তামসাৎ—তামস অহঙ্কার থেকে; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ভূত-আদেঃ**—জড় উপাদানসমূহের; **বিকুর্বাণাৎ**—রূপান্তরিত হওয়ার ফলে; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছে; **নভঃ**—আকাশ; **তস্য**—তার; **মাত্রা**—সূক্ষ্মরূপ; **গুণঃ**—গুণ; **শব্দঃ**—শব্দ; **লিঙ্গম্**—বৈশিষ্ট্য; **যৎ**—যার; **দ্রষ্টৃ**—দ্রষ্টা; **দৃশ্যয়োঃ**—দৃশ্য।

অনুবাদ

তামস অহঙ্কার থেকে প্রথমে পঞ্চ মহাভূতের প্রথম উপাদান আকাশের উৎপত্তি হয়েছে। সেই আকাশের সূক্ষ্মরূপ হচ্ছে শব্দ, ঠিক যেমন দ্রষ্টার সঙ্গে দৃশ্যের সম্পর্ক।

তাৎপর্য

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং মাটি এই পঞ্চমহাভূত তামস অহঙ্কারের বিভিন্ন গুণ। অর্থাৎ মহত্তত্ত্বরূপে অহঙ্কার ভগবানের তটস্থা শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এবং জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার এই মিথ্যা অহঙ্কারের ফলে জীবের মিথ্যা ভোগের জন্য সমস্ত উপাদানগুলির সৃষ্টি হয়েছে। জীব ভোক্তারূপে জড় উপাদানগুলির উপর কর্তৃত্ব করে যদিও তার পটভূমিতে থাকেন পরমেশ্বর ভগবান। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান ছাড়া আর কেউ ভোক্তা হতে পারে না, কিন্তু ভ্রান্তিবশত জীব ভোক্তা হওয়ার বাসনা করে। এইটিই হচ্ছে অহঙ্কারের উৎস। বিভ্রান্ত জীব যখন সেই বাসনা করে তখন ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে ছায়ারূপী উপাদানগুলির সৃষ্টি হয়, এবং বদ্ধ জীব মরীচিকার পিছনে ধাবিত হওয়ার মতো সেগুলির পিছনে ধাবিত হয়।

শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে যে,প্রথমে তন্মাত্র শব্দের সৃষ্টি হয়েছে এবং তারপর আকাশ এবং এই শ্লোকে সেকথা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। কিন্তু শব্দ হচ্ছে আকাশের সূক্ষ্মরূপ, এবং তাদের পার্থক্য দ্রষ্টা এবং দৃশ্যের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সেই রকম। কোন বস্তু

সম্পর্কে কথা বললে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তা থেকে বস্তুটির বিষয়ে একটি ধারণা এনে দেয় বলে ধ্বনি হল প্রকৃত বস্তুর প্রতিরূপ। তাই শব্দ হচ্ছে বস্তুর সূক্ষ্ম লক্ষণ। তেমনই ভগবানের গুণাবলীর দ্যোতক শব্দরূপে ভগবানের যে প্রকাশ তা ভগবানেরই পূর্ণ প্রকাশ, যা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রের পিতা বসুদেব এবং মহারাজ দশরথ দর্শন করেছিলেন। ভগবানের শব্দরূপ স্বয়ং ভগবান থেকে অভিন্ন কেননা ভগবান এবং তার শব্দরূপ উভয়ই পরম তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে,ভগবানের দিব্য নামে, ভগবানের শব্দরূপে, ভগবানের সমস্ত শক্তি অর্পিত হয়েছে। তাই ভগবানের শুদ্ধ নাম উচ্চারণের ফলে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়, এবং তখন ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সম্মুখে ভগবান প্রকাশিত হন। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত এক পলকের জন্যও ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। তাই যে ভক্ত নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করতে চান,শাস্ত্রে তাঁকে ভগবানের দিব্য নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—নিরন্তর উচ্চারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যিনি এভাবে ভগবানের সঙ্গ করতে সক্ষম,তিনি অবশ্যই মিথ্যা অহঙ্কার প্রসূত জড় জগতের অজ্ঞান অন্ধকার থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হবেন (*তমসি মা জ্যোতির্গম*)।

শ্লোক ২৬-২৯

নভসোঽথ বিকুর্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোঽনিলঃ।
পরন্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহো বলম্ ॥ ২৬ ॥

বায়োরপি বিকুর্বাণাৎ কালকর্মস্বভাবতঃ।
উদপদ্যত তেজো বৈ রূপবৎ স্পর্শশব্দবৎ ॥ ২৭ ॥

তেজসস্তু বিকুর্বাণাদাসীদম্ভো রসাত্মকম্।
রূপবৎ স্পর্শবচ্চাম্ভো ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎ ॥২৮ ॥

বিশেষস্তু বিকুর্বাণাদম্ভসো গন্ধবানভূ ।
পরান্বয়াদ্রসস্পর্শশব্দরূপগুণান্বিতঃ ॥ ২৯ ॥

নভসঃ—আকাশের; **অথ**—এইভাবে; **বিকুর্বাণাৎ**—রূপান্তরিত হয়ে; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছে; **স্পর্শ**—স্পর্শ; **গুণঃ**—গুণ; **অনিলঃ**—বায়ু; **পর**—পূর্ববর্তী; **অন্বয়াৎ**—ক্রমান্বয়ে; **শব্দবান্**—ধ্বনির দ্বারা পূর্ণ; **চ**—ও; **প্রাণঃ**—প্রাণ; **ওজঃ**—ইন্দ্রিয়ানুভূতি; **সহঃ**—মেদ; **বলম্**—বল; **বায়োঃ**—বায়ুর; **অপি**—ও; **বিকুর্বাণাৎ**—রূপান্তরের ফলে; **কাল**—কাল; **কর্ম**—পূর্বকৃত কর্মের ফল; **স্বভাবতঃ**—প্রকৃতির ভিত্তিতে; **উদপদ্যত**—উৎপন্ন হয়েছে; **তেজঃ**—অগ্নি; **বৈ**—যথাক্রমে; **রূপবৎ**—রূপসহ; **স্পর্শ**—স্পর্শ; **শব্দবৎ**—শব্দসহ; **তেজসঃ**—অগ্নির; **তু**—কিন্তু; **বিকুর্বাণাৎ**—রূপান্তরিত হওয়ার ফলে; **আসীৎ**—হয়েছে; **অম্ভঃ**—জল;

রসাত্মকম্—রস দ্বারা নির্মিত ; **রূপবৎ**—রূপসহ ; **স্পর্শবৎ**—স্পর্শসহ ; **চ**—এবং ; **অম্ভ**—জল ; **ঘোষবৎ**—শব্দসহ ; **চ**—এবং ; **পর**—পূর্ববর্তী ; **অন্বয়াৎ**—ক্রমান্বয়ে ; **বিশেষঃ**—বৈচিত্র্য ; **তু**—কিন্তু ; **বিকুর্বাণাৎ**— রূপান্তরের দ্বারা ; **অম্ভসঃ**—জলের ; **গন্ধবান্**—গন্ধময় ; **অভূৎ**—হয়েছে ; **পর**— পূর্ববর্তী ; **অন্বয়াৎ**—ক্রমান্বয়ে ; **রস**—রস ; **স্পর্শ**—স্পর্শ ; **শব্দ**—শব্দ ; **রূপ-গুণ-অন্বিতঃ**—রূপ এবং গুণ সমন্বিত।

অনুবাদ

আকাশের রূপান্তরের ফলে স্পর্শ গুণযুক্ত বায়ুর উৎপত্তি হয়েছে, এবং কারণরূপে তাতে আকাশের সম্বন্ধ থাকাতে বায়ুতেও শব্দগুণ রয়েছে। বায়ুই দেহধারণ, ইন্দ্রিয় অনুভূতি, মানসিক বল ও শরীরের শক্তির হেতু কাল, কর্ম ও স্বভাববশত বায়ুর বিকারের ফলে আগুন উৎপন্ন হয়। আগুনের গুণ রূপ। আকাশ ও বায়ু তেজের কারণ হওয়াতে তেজেও রূপসহ শব্দ ও স্পর্শ গুণ বিরাজিত। আগুনের বিকারের ফলে রসাত্মক জলের উৎপত্তি হয়। জলে আকাশ, বায়ু ও তেজের কারণরূপ সম্বন্ধ থাকাতে তাতে যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ বর্তমান। জলের বিকার থেকে মাটি উৎপন্ন হয়। মাটির স্বাভাবিক গুণ গন্ধ। এই মাটিতে আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলের কারণরূপ সম্বন্ধ থাকাতে মাটিতে সেগুলির গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস বর্তমান।

তাৎপর্য

সমগ্র সৃষ্টির প্রক্রিয়া হচ্ছে ক্রমান্বয়ে এক উপাদান থেকে আর এক উপাদানের বিবর্তন এবং বিকাশ যা ক্রমান্বয়ে বৃক্ষ, লতা, পর্বত, নদী, সরীসৃপ, পক্ষী, জীবজন্তু এবং বিভিন্ন প্রকার মানুষ আদি বহুরূপে পৃথিবীর বৈচিত্র্যে পর্যবসিত হয়। ইন্দ্রিয় অনুভূতির গুণও ক্রমবিকাশশীল। যেমন আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং মাটির ক্রমবিকাশের সাথে সাথে শব্দ থেকে স্পর্শ, স্পর্শ থেকে রূপ, রূপ থেকে রস এবং রস থেকে গন্ধের উৎপত্তি হয়। তারা একে অপরের কারণ এবং কার্য, কিন্তু মূল কারণ হচ্ছে ভগবানের অংশ অবতার কারণ সমুদ্রে শয়ান মহাবিষ্ণু। ব্রহ্ম-সংহিতাতে শ্রীকৃষ্ণকে সর্বকারণের পরম কারণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং ভগবদ্গীতাতেও (১০/৮) সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে—

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাব-সমন্বিতাঃ ॥

ইন্দ্রিয় অনুভূতির সমস্ত গুণ মাটিতে পূর্ণরূপে রয়েছে, এবং অন্যান্য সমস্ত উপাদানে তা অল্পমাত্রায় রয়েছে। আকাশে কেবল শব্দের গুণ, কিন্তু বায়ুতে শব্দ এবং স্পর্শের গুণ, অগ্নিতে শব্দ-স্পর্শ এবং রূপ, এবং জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস রয়েছে। কিন্তু মাটিতে এই সবকটি গুণ তো রয়েছে উপরন্তু গন্ধ গুণ রয়েছে। অতএব মাটিতে জীবনের পূর্ণ বৈচিত্র্যের প্রদর্শন হয়, যা মূলত বায়ুর ভিত্তিতে শুরু হয়। শরীরের রোগ

জীবের জড়জাগতিক শরীরের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর বিশৃঙ্খলার ফলে উৎপন্ন হয়। দেহের অভ্যন্তরস্থ বায়ুর বিশেষ বিশৃঙ্খলার ফলে মানসিক রোগ উৎপন্ন হয়। অতএব যোগ ব্যায়াম বায়ুর নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বিশেষ লাভপ্রদ, এবং তার ফলে শরীরের রোগ প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা যায়। যথাযথভাবে তার অভ্যাসের ফলে বায়ু বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্যুকে পর্যন্ত বশ করা যায়। সিদ্ধযোগী মৃত্যুকে বশ করে সূক্ষ্মলোকে স্থানান্তরিত হওয়ার উপযুক্ত সময়ে দেহ ত্যাগ করতে পারেন। ভক্তিযোগী কিন্তু তাঁর ভক্তির প্রভাবে এই সমস্ত যোগীদের অতিক্রম করেছেন, এবং তিনি সবকিছুর নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছার প্রভাবে জড়া প্রকৃতির অতীত চিৎ জগতের কোন একটি গ্রহে উন্নীত হতে পারেন।

শ্লোক ৩০

বৈকারিকান্মনো জজ্ঞে দেবা বৈকারিকা দশ।
দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বি-বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ ॥ ৩০ ॥

বৈকারিকাৎ—সাত্ত্বিক অহঙ্কার থেকে; **মনঃ**—মন; **জজ্ঞে**—উদ্ভূত হয়েছে; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **বৈকারিকা**—সাত্ত্বিক অহঙ্কারে; **দশ**—দশ; **দিক্**—দিকসমূহের নিয়ন্তা; **বাত**—বায়ুর নিয়ন্তা; **অর্ক**—সূর্য; **প্রচেতঃ**—প্রচেত; **অশ্বি**—অশ্বিনী কুমারদ্বয়; **বহ্নী**—অগ্নিদেবতা; **ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্র; **উপেন্দ্র**—স্বর্গের শ্রীবিগ্রহ; **মিত্র**—দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম; **কাঃ**—প্রজাপতি ব্রহ্মা।

অনুবাদ

বৈকারিক অহঙ্কার থেকে মন উদ্ভূত হয়ে ব্যক্ত হয়েছে, সেই সঙ্গে শরীরের গতি নিয়ন্ত্রক দশটি দেবতাও প্রকট হয়েছেন। এই সমস্ত দেবতারা হচ্ছেন দিকসমূহের নিয়ন্তা, বায়ুর নিয়ন্তা পবনদেব, সূর্যদেব, দক্ষ প্রজাপতির পিতা, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গের শ্রীবিগ্রহ উপেন্দ্র, আদিত্যদেবগণের প্রধান মিত্র এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা।

তাৎপর্য

বৈকারিক হল সৃষ্টির নিরপেক্ষ অবস্থা এবং তেজস হল সৃষ্টির প্রবর্তক, আর তমস হচ্ছে অজ্ঞানের প্রভাবে সেই জড় সৃষ্টির পূর্ণ প্রদর্শন। কলকারখানায় 'জীবনের আবশ্যকতা সমূহ' নির্মাণ কলিযুগের বা যান্ত্রিক যুগে অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে, এবং তা হচ্ছে তমোগুণের সর্বোচ্চ অবস্থা। মানব সমাজের এই প্রকার নির্মাণকারী উদ্যোগ তমোগুণে সম্পন্ন হয় কেননা প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত নির্মিত সামগ্রীর কোন প্রয়োজন নেই। মানব সমাজের প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে জীবন ধারণের জন্য আহার, নিদ্রার জন্য গৃহ বা আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয়, এবং ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বস্তু সমূহ।

ইন্দ্রিয়গুলি জীবনের বাস্তব লক্ষণ, যা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হবে। মানব সভ্যতার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে শুদ্ধ করা, এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সরবরাহ আবশ্যকতা অনুসারে হওয়া উচিত, কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়গুলির আবশ্যকতা বৃদ্ধি করার জন্য নয়।

আহার, আশ্রয়, আত্মরক্ষা এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তি—এগুলি জড় জীবনের আবশ্যকতা। তা না হলে, শুদ্ধ নির্মল স্বরূপে জীবের এগুলির প্রয়োজন হয় না। তাই এই সমস্ত প্রয়োজনগুলি কৃত্রিম, এবং জীবনের শুদ্ধ অবস্থায় সেগুলির কোন প্রয়োজন নেই।

প্রকৃতপক্ষে, কৃত্রিমভাবে প্রয়োজনগুলি বৃদ্ধি করা, যা জড় সভ্যতার স্বাভাবিক বৃত্তি, তা অজ্ঞান তামসিক কার্যকলাপ। এই প্রকার কার্যকলাপের ফলে মানুষের শক্তির অপচয় হয় কেননা মানবিক শক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান হৃষীকেশের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য ইন্দ্রিয় সমূহকে পবিত্র করা।

পরমেশ্বর ভগবান অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের পরম অধীশ্বর হওয়ার ফলে তিনি হচ্ছেন ইন্দ্রিয়ের অধিপতি হৃষীকেশ। হৃষীক শব্দটির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয় সমূহ, এবং ঈশ মানে ঈশ্বর। ভগবান ইন্দ্রিয়ের দাস নন, অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়ের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হন না, কিন্তু বদ্ধ জীবেরা ইন্দ্রিয়ের দাস। তারা ইন্দ্রিয়ের নির্দেশ অনুসারে পরিচালিত হয়, তাই জড় সভ্যতা হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের ব্যবস্থা মাত্র।

ইন্দ্রিয় তৃপ্তিরূপী রোগের নিরাময় সাধন করা মানব সভ্যতার মানদণ্ড হওয়া উচিত, এবং ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় সমূহের সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত হওয়ার মাধ্যমে অনায়াসে তা সম্পাদন করা সম্ভব।

ইন্দ্রিয়গুলিকে তাদের কার্যকলাপ থেকে বিরত করা যায় না, কিন্তু সেগুলিকে হৃষীকেশের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের শুদ্ধ সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমে পবিত্র করা যায়। এইটিই হচ্ছে সমগ্র ভগবদ্গীতার উপদেশ।

অর্জুন প্রথমে তাঁর নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্যে তাঁর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ভগবদ্গীতার জ্ঞান দান করে তাঁর চেতনাকে পবিত্র করে তাঁর ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনের জন্য যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বাসনা অনুসারে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছিলেন।

বেদ নির্দেশ দিয়েছে অজ্ঞতাচ্ছন্ন জীবন থেকে আলোকের পথে গমন করতে *(তমসো মা জ্যোতির্গময়)।* এই আলোকের পথ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধন করা। বিভ্রান্ত অথবা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা অর্জুন এবং অন্যান্য ভগবদ্ভক্ত কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থায় পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধনের প্রচেষ্টা না করে আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করতে চায়। ভগবানের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করার পরিবর্তে তারা কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ স্তব্ধ করতে চায় (যোগ প্রক্রিয়ার

মাধ্যমে), অথবা ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করে (জ্ঞানের পন্থার মাধ্যমে)।

ভগবদ্ভক্তেরা কিন্তু এই সমস্ত যোগী এবং জ্ঞানীদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে কেননা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করেন না; তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করতে চান। অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার ফলেই কেবল যোগী এবং জ্ঞানীরা ভগবানের ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করে এবং কৃত্রিমভাবে তাদের রোগগ্রস্ত ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ সংযত করার চেষ্টা করে। রোগগ্রস্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি জড়জাগতিক প্রয়োজনগুলি বৃদ্ধি করার ব্যাপারে অত্যন্ত সক্রিয় হয়।

কেউ যখন ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বর্ধিত করার কুফল দর্শন করতে পারেন, তখন তাঁকে বলা হয় জ্ঞানী এবং কেউ যখন যৌগিক প্রথার মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ স্তব্ধ করার চেষ্টা করেন, তাঁকে বলা হয় যোগী, কিন্তু যখন কেউ পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় সমূহের সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা করেন, তাঁকে বলা হয় ভগবদ্ভক্ত।

ভগবদ্ভক্তেরা কখনো ভগবানের ইন্দ্রিয়গুলিকে অস্বীকার করেন না, অথবা কৃত্রিমভাবে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করার চেষ্টা করেন না। পক্ষান্তরে তাঁরা স্বতস্ফূর্ত ভাবে পরিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের যিনি ঈশ্বর তাঁরই সেবায় যুক্ত হন, ঠিক যেভাবে অর্জুন যুক্ত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তাঁরা অনায়াসে সমস্ত পূর্ণতার চরম লক্ষ্য ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হন।

শ্লোক ৩১

তৈজসাত্তু বিকুর্বাণাদিন্দ্রিয়াণি দশাভবন্।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধিঃ প্রাণশ্চ তৈজসৌ।
শ্রোত্রং ত্বগ্ঘ্রাণদৃগ্জিহ্বা-বাগ্দোর্মেঢ্রাঙ্ঘ্রি-পায়বঃ ॥ ৩১ ॥

তৈজসাৎ—রাজস অহঙ্কার থেকে; **তু**—কিন্তু; **বিকুর্বাণাৎ**—বিকারের ফলে; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **দশ**—দশ; **অভবন্**—উৎপত্তি হয়েছে; **জ্ঞানশক্তিঃ**—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়; **ক্রিয়াশক্তিঃ**—পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **প্রাণঃ**—জীবনী শক্তি; **চ**—ও; **তৈজসৌ**—তৈজস অহঙ্কারপ্রসূত সমস্ত বস্তু; **শ্রোত্রম্**—শ্রবণেন্দ্রিয়; **ত্বক্**—ত্বকেন্দ্রিয়; **ঘ্রাণ**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়; **দৃগ্**—দর্শনেন্দ্রিয়; **জিহ্বাঃ**—রসনেন্দ্রিয়; **বাগ্**—বাক্-ইন্দ্রিয়; **দোঃ**—হস্ত; **মেঢ্র**—উপস্থ; **অঙ্ঘ্রি**—পাদ; **পায়বঃ**—পায়ু।

অনুবাদ

রাজস অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হলে তা থেকে জ্ঞানশক্তি, বুদ্ধি এবং ক্রিয়াশক্তি প্রাণসহ কর্ণ, ত্বক, নাসিকা, চক্ষু, জিহ্বা, বাক্, পাণি, উপস্থ, পাদ এবং পায়ু এই দশটি ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

জড় জগতে জীবন কমবেশি বুদ্ধি এবং প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি কঠোর জীবন সংগ্রামের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য বুদ্ধিকে সহায়তা করে, এবং প্রাণশক্তি হস্ত, পদ আদি কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে ব্যবহার করার মাধ্যমে জীবন ধারণ করে। কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিতে জীবন সংগ্রাম রজোগুণের কার্য। তাই বুদ্ধি এবং প্রাণসহ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি রজোগুণ নামক প্রকৃতির দ্বিতীয় গুণটি থেকে উৎপন্ন হয়। এই রজোগুণটি কিন্তু বায়ু থেকে উৎপন্ন হয়, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ৩২

যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ।
যদায়তননির্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম্ ॥ ৩২ ॥

যদা—যতক্ষণ পর্যন্ত; **এতে**—এই সমস্ত; **অসঙ্গতাঃ**—মিলিত না হয়ে; **ভাবাঃ**—এইভাবে অবস্থান করে; **ভূত**—উপাদান সমূহ; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সমূহ; **মনঃ**—মন; **গুণাঃ**—প্রকৃতির গুণসমূহ; **যদা**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **আয়তন**—শরীর; **নির্মাণে**—নির্মাণ ব্যাপারে; **ন-শেকুঃ**—সম্ভব নয়; **ব্রহ্ম-বিত্তম্**—হে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ নারদ।

অনুবাদ

হে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ নারদ! এই সমস্ত সৃষ্ট অংশগুলি, যথা পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয়-সমূহ, মন এবং প্রকৃতির গুণগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না মিলিত হয়, ততক্ষণ শরীর সৃষ্টি সম্ভব হয় না।

তাৎপর্য

জীবের বিভিন্ন প্রকার শরীর কারখানায় বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ের ফলে প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকার মোটর গাড়ির মতো। মোটর গাড়ি যখন প্রস্তুত হয়, তখন ড্রাইভার সেই গাড়ির আসনে বসে তার ইচ্ছা অনুসারে গাড়িটিকে চালায়। সে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (১৮/৬১) প্রতিপন্ন হয়েছে। জীব দেহরূপ যন্ত্রে বসে আছে, এবং সেই দেহরূপী যানটি চালিত হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, ঠিক যেমন একটি রেলগাড়ি যা চালকের পরিচালনায় চালিত হয়।

জীব কিন্তু তার শরীর নয়; তার দেহরূপী যন্ত্রটি থেকে ভিন্ন। কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন জড় বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারে না কিভাবে ইন্দ্রিয়সমূহ মন এবং প্রকৃতির গুণের সমন্বয়ে দেহটির সৃষ্টি হয়। প্রতিটি জীব পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ এক-একটি চিৎ স্ফুলিঙ্গ, এবং পিতা যেমন তাঁর পুত্রের প্রতি স্নেহপরায়ণ, তেমনই পরম পিতা ভগবানের কৃপার প্রভাবে জীব জড় জগতের উপর তাঁর ইচ্ছানুসারে আধিপত্য করার ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে।

পিতা যেমন ক্রন্দনরত পুত্রকে শান্ত করার জন্য খেলনা দেন, তেমনই মোহাচ্ছন্ন জীবদের বাসনা অনুসারে আধিপত্য করার জন্য ভগবান তাঁর ইচ্ছা শক্তির দ্বারা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, এবং এখানে জীব ভগবানের প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্বতন্ত্রভাবে এই জড় জগতের উপর আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে।

বদ্ধ জীবদের অবস্থা ঠিক ভগবানের দাসীর (প্রকৃতির) অধীনে জড় জগতরূপী উদ্যানে ক্রিয়াশীল শিশুদের মতো। তারা মায়াকে, ভগবানের দাসীকে, সর্বেসর্বা বলে মনে করে এবং ভ্রান্তভাবে ধারণা করে যে পরম তত্ত্ব হচ্ছেন প্রকৃতি (দুর্গা দেবী ইত্যাদি)।

মূর্খ শিশু সদৃশ জড়বাদীরা ভগবানের দাসীরূপা জড়া প্রকৃতির অতীত কোন ধারণা পোষণ করতে পারে না। কিন্তু ভগবানের বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রেরা ভালভাবে জানেন যে, জড়া প্রকৃতির সমস্ত কার্যকলাপ ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, ঠিক যেমন একজন দাসী অপরিণত শিশুদের পিতারূপ কোন প্রভুর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে।

দেহের বিভিন্ন অংশগুলি, যেমন ইন্দ্রিয়-সমূহ, মহত্তত্ত্ব থেকে সৃষ্ট, এবং ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে যখন সেগুলি মিলিত হয়, তখন জড় শরীরের সৃষ্টি এবং জীবকে তার ইচ্ছা অনুসারে কার্য করার জন্য সেটিকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে।

শ্লোক ৩৩

তদা সংহত্য চান্যোন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।
সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ ॥ ৩৩ ॥

তদা—সেই সমস্ত; **সংহত্য**—মিলিত হয়ে; **চ**—ও; **অন্যোন্যম্**—পরস্পর; **ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক; **শক্তি**—শক্তি; **চোদিতাঃ**—প্রযুক্ত হয়ে; **সদসত্ত্বম্**—মুখ্যত এবং গৌণত; **উপাদায়**—স্বীকার করে; **চ**—ও; **উভয়ম্**—উভয়; **সসৃজুঃ**—সৃষ্ট হয়েছে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অদঃ**—এই ব্রহ্মাণ্ড।

অনুবাদ

এইভাবে ভগবানের শক্তির দ্বারা এইগুলি একত্রিত হওয়ার ফলে সৃষ্টির মুখ্য এবং গৌণ কারণসমূহ স্বীকার করে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকট হয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান সৃষ্টির জন্য তাঁর বিভিন্ন শক্তি প্রযুক্ত করেন। এমন নয় যে, তিনি স্বয়ং জড় সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হন। তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তিতে নিজেকে বিস্তার করে, এবং বিভিন্ন অংশে নিজেকে বিস্তার করে

এই জড় জগতকে প্রকাশ করেন। ব্রহ্মজ্যোতির চিদাকাশে এক কোণে কখনো কখনো এক চিন্ময় মেঘের প্রকাশ হয় এবং সেই আচ্ছাদিত অংশটিকে বলা হয় মহত্তত্ত্ব। ভগবান তখন মহাবিষ্ণুরূপে কারণ জল নামক মহত্তত্ত্বের জলে শয়ন করেন। মহাবিষ্ণু যখন সেই কারণ সমুদ্রে শয়ন করেন তখন তাঁর নিশ্বাসের প্রভাবে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়।

এই ব্রহ্মাণ্ডগুলি কারণ-সমুদ্রে বুদ্‌বুদের মতো ভাসছে এবং সেগুলি কারণ-সমুদ্রের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলির অস্তিত্ব কেবল মহাবিষ্ণুর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় পর্যন্ত। সেই মহাবিষ্ণু তারপর প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের গোলোকে গর্ভোদক্‌শায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন এবং শেষনাগরূপী তাঁর অবতার কর্তৃক নির্মিত শয্যায় শায়িত হন। তাঁর নাভিদেশ থেকে একটি পদ্ম তখন উত্থিত হয় এবং সেই পদ্মে ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা ব্রহ্মার জন্ম হয়। ব্রহ্মা তখন এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর বিভিন্ন জীবদের বাসনা অনুসারে তাদের বিভিন্ন প্রকার রূপ প্রদান করেন। তিনি সূর্য, চন্দ্র তথা অন্য দেবতাদেরও সৃষ্টি করেন।

তাই জড় সৃষ্টির মুখ্য শিল্পী স্বয়ং ভগবান, যে কথা ভগবদ্গীতায় (৯/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে। তিনি জড়া প্রকৃতিকে সর্বপ্রকার স্থাবর এবং জঙ্গম সৃষ্টির জন্য নির্দেশ দেন।

জড় সৃষ্টি দুই প্রকার—মহাবিষ্ণুর দ্বারা সমষ্টিগত ব্রহ্মাণ্ড সমূহের সৃষ্টি, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং একক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। উভয় সৃষ্টিই ভগবান কর্তৃক সম্পাদিত হয়, এবং তার ফলে আমাদের গোচরীভূত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হয়।

শ্লোক ৩৪

বর্ষপূগসহস্রান্তে তদণ্ডমুদকেশয়ম্।
কালকর্মস্বভাবস্থো জীবোঽজীবমজীবয়ৎ ॥ ৩৪ ॥

বর্ষপূগ—বহু বছর; **সহস্রান্তে**—হাজার হাজার বছরের পর; **তৎ**—তা; **অণ্ডম্**—ব্রহ্মাণ্ড; **উদকে**—কারণ বারিতে; **শয়ম্**—নিমজ্জিত হয়ে; **কাল**—নিত্য কাল; **কর্ম**—কর্ম; **স্বভাবস্থঃ**—প্রকৃতির গুণ অনুসারে; **জীবঃ**—জীবের ঈশ্বর; **অজীবম্**—জড়কে; **অজীবয়ৎ**—জীবিত করেছেন।

অনুবাদ

এইভাবে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডসমূহ হাজার হাজার বছর কারণ-সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত ছিল। তারপর সমস্ত জীবের ঈশ্বর ভগবান তাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে সেগুলিকে পূর্ণরূপে সজীব করেন।

তাৎপর্য

ভগবানকে এখানে জীব বলে বর্ণনা করা হয়েছে কেননা তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবদের ঈশ্বর। বেদে তাঁকে অন্য সমস্ত *নিত্যদের মধ্যে পরম নিত্য* বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

জীবের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক পুত্রের সঙ্গে পিতার সম্পর্কের মতো। গুণগতভাবে পিতা এবং পুত্র সমান, কিন্তু তা হলেও পিতা কখনো পুত্র নন, অথবা পুত্র কখনো তার জন্মদাতা পিতা নন। অতএব, পূর্বকৃত বর্ণনা অনুসারে, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু বা হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন এবং জড়া প্রকৃতির গর্ভে জীবেদের সঞ্চার করে ব্রহ্মাণ্ডগুলিকে সজীব করেন, যে কথা ভগবদ্গীতায় (১৪/৩) প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রত্যেক সৃষ্টির প্রলয়ের পর সমস্ত জীব ভগবানের শরীরে লীন হয়ে যায় এবং পুনরায় যখন সৃষ্টি হয়, তখন জড়া প্রকৃতির গর্ভে তারা সঞ্চারিত হয়। তাই জড় জগতে জড়া প্রকৃতি জীবের মাতা সদৃশ এবং ভগবান হচ্ছেন পিতা। কিন্তু জীব যখন জড় জগতে সক্রিয় হয়, তখন তারা কাল এবং মায়াশক্তির বশীভূত হয়ে তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে কর্ম করতে শুরু করে এবং তার ফলে বিভিন্ন প্রকার জীবের প্রকাশ হয়। তাই ভগবান হচ্ছেন জড় জগতে সমস্ত সজীবতার পরম কারণ।

শ্লোক ৩৫

স এব পুরুষস্তস্মাদণ্ডং নির্ভিদ্য নির্গতঃ।
সহস্রোর্বঙ্ঘ্রি বাহ্বক্ষঃ সহস্রাননশীর্ষবান্ ॥ ৩৫ ॥

সঃ—তিনি (ভগবান); **এব**—স্বয়ং; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **তস্মাৎ**— ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তর থেকে; **অণ্ডম্**—হিরণ্যগর্ভ; **নির্ভিদ্য**—বিভাজিত করে; **নির্গতঃ**— নির্গত হয়েছে; **সহস্র**—হাজার হাজার; **উরু**—জঙ্ঘা; **অঙ্ঘ্রি**—পা; **বাহু**—হস্ত; **অক্ষঃ**—অক্ষি; **সহস্র**—সহস্র; **আনন**—মুখ; **শীর্ষবান্**—মস্তক সহ।

অনুবাদ

যদিও ভগবান (মহাবিষ্ণু) কারণ সমুদ্রে শায়িত রয়েছেন, তথাপি তিনি তার থেকে নির্গত হয়ে নিজেকে হিরণ্যগর্ভরূপে বিভক্ত করে প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেছেন এবং শত-সহস্র পাদ, হস্ত, মুখ, অক্ষি, মস্তক ইত্যাদি সহ বিরাটরূপ পরিগ্রহ করেছেন।

তাৎপর্য

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর যে ভুবনের বিস্তার হয়েছে তা ভগবানের বিরাট রূপের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত। তার বর্ণনা পরবর্তী শ্লোকে করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।
কট্যাদিভিরধঃ সপ্ত সপ্তোর্ধ্বং জঘনাদিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

যস্য—যার; **ইহ**—এই ব্রহ্মাণ্ডের; **অবয়বৈঃ**—শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা; **লোকান্**—সমস্ত লোকসমূহ; **কল্পয়ন্তি**—কল্পনা করে; **মনীষিণঃ**—বড় বড়

দার্শনিকেরা ; **কটি-আদিভিঃ**—কোমরের নীচে ; **অধঃ**—নিম্নভাগে ; **সপ্ত**—সাতটি ; **সপ্ত-ঊর্ধ্বম্**—ঊর্ধভাগে সাতটি ; **জঘনাদিভিঃ**—সামনের অংশ।

অনুবাদ

বড় বড় দার্শনিকেরা কল্পনা করে যে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকসমূহ ভগবানের বিরাটরূপে ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন ভাগের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রদর্শন।

তাৎপর্য

এখানে কল্পয়ন্তি বা 'কল্পনা করে' শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যে সমস্ত কল্পনাপ্রবণ দার্শনিকেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত দ্বিভুজ রূপ স্বীকার করতে অক্ষম, ভগবানের বিরাট রূপ হচ্ছে তাদের কল্পনা। যদিও মহান্ দার্শনিকদের কল্পিত বিরাট রূপ ভগবানেরই একটি স্বরূপ, তথাপি তা কল্পনাপ্রসূত। কথিত হয় যে সাতটি ঊর্ধ্ব লোক বিরাট রূপের কটিদেশের উপরিভাগে অবস্থিত, এবং সাতটি নিম্ন লোক তাঁর কটি দেশের নিম্নভাগে অবস্থিত। এখানে এই ধারণা প্রদান করা হয়েছে যে,পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্বন্ধে সচেতন, এবং এই সৃষ্টিতে কোন কিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণের অতীত নয়।

শ্লোক ৩৭

পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ।
ঊর্বোর্বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ব্যজায়ত ॥ ৩৭ ॥

পুরুষস্য—পরমেশ্বর ভগবানের ; **মুখম্**—মুখ ; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণগণ ; **ক্ষত্রম্**—ক্ষত্রিয় বর্ণ ; **এতস্য**—তাঁর ; **বাহবঃ**—বাহুদ্বয় ; **ঊর্বোঃ**—উরুদ্বয় ; **বৈশ্যঃ**—বৈশ্য সম্প্রদায় ; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **পদ্ভ্যাম্**—পদযুগল থেকে ; **শূদ্রঃ**—শ্রমিক সম্প্রদায় ; **ব্যজায়ত**—প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা ভগবানের মুখ, ক্ষত্রিয়েরা তাঁর বাহু, বৈশ্যরা তাঁর জঙ্ঘা এবং শূদ্রেরা তাঁর পদ যুগল থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

তাৎপর্য

সমস্ত জীবদের ভগবানের অবিচ্ছেদ্য বিভিন্ন অংশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং এই শ্লোকটিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কিভাবে তা নির্ণয় করা হয়। মানব সমাজের চারটি বর্ণ, যথা বুদ্ধিমান সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণ), পরিচালক বর্গ (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (বৈশ্য), এবং শ্রমিক সম্প্রদায় (শূদ্র) হচ্ছে ভগবানের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ।

প্রকৃতপক্ষে কেউই ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। স্বরূপত দেহের মুখ এবং পা দেহ থেকে অভিন্ন, কিন্তু গুণগতভাবে মস্তক পা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেই সঙ্গে মুখ, পা, হাত এবং জঙ্ঘা সবই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ। ভগবানের শরীরের এই সমস্ত অঙ্গগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে পূর্ণ ভগবানের সেবা করা। মুখের উদ্দেশ্য কথা বলা, হাতের উদ্দেশ্য দেহকে রক্ষা করা, পায়ের উদ্দেশ্য দেহকে বহন করে নিয়ে যাওয়া, এবং উদরের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেহকে পালন করা।

তাই সমাজের বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের উদ্দেশ্যে কথা বলা এবং ভগবানের তৃপ্তি সাধনের জন্য অন্ন গ্রহণ করা। ভগবানের ক্ষুধার তৃপ্তি হয় যজ্ঞের ফল গ্রহণের ফলে। ব্রাহ্মণ বা বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে এই সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদন করা, এবং ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে এই প্রকার যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করা।

ভগবানের উদ্দেশ্যে কথা বলার অর্থ হচ্ছে যথাযথভাবে ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান বিচার করার মাধ্যমে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা। তার ফলে ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ এবং ভগবানের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক সম্বন্ধে সকলে অবগত হতে পারে। তাই ব্রাহ্মণদের কর্তব্য বৈদিক জ্ঞান বা পরম জ্ঞান সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হওয়া।

বেদের অর্থ জ্ঞান, এবং অন্ত মানে তার শেষ। ভগবদ্গীতার বর্ণনা অনুসারে ভগবান হচ্ছেন সবকিছুর উৎস *(অহং সর্বস্য প্রভবঃ)*, এবং সেই সূত্রে সমস্ত জ্ঞানের অন্ত (বেদান্ত) হচ্ছে ভগবানকে জানা, ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং সেই সম্পর্ক অনুসারেই কেবল আচরণ করা।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সঙ্গে দেহ সম্পর্কিত; তেমনই, প্রতিটি জীবের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হওয়া। বিশেষ করে মনুষ্য জীবনে সেইটি হচ্ছে চরম উদ্দেশ্য, অর্থাৎ যথাযথভাবে প্রতিটি জীবের সঙ্গে ভগবানের প্রকৃত সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হওয়া। এই সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত না হলে মনুষ্য জীবন ব্যর্থ হয়।

বুদ্ধিমান সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণদের, তাই বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে জীবের সঙ্গে ভগবানের এই সম্পর্ক সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রচার করে আদর্শ পথে জনসাধারণকে পরিচালিত করা। ক্ষত্রিয় বর্গের কর্তব্য জীবেদের রক্ষা করা যাতে তারা সেই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে; ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কর্তব্য হচ্ছে খাদ্য শস্য উৎপাদন করে তা সমগ্র মানব সমাজকে বিতরণ করা যাতে জনসাধারণ সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করে মানব জীবনের কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে।

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আর একটি কর্তব্য হচ্ছে গাভীদের রক্ষা করা। গাভী যথেষ্ট পরিমাণে দুধ প্রদান করে যা পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভে উপযুক্ত সভ্যতার পালন পোষণের জন্য যে বুদ্ধিমত্তা এবং স্বাস্থ্যের প্রয়োজন তা প্রদানে সমর্থ। আর শ্রমিক সম্প্রদায়, যারা

বুদ্ধিমান নয় অথবা শক্তিশালী নয়, তারা তাদের দৈহিক শ্রমের দ্বারা উচ্চতর বর্ণের সেবা করার মাধ্যমে লাভবান হতে পারে।

এইভাবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের সম্পর্কে সম্পর্কিত একটি পূর্ণ একক, এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে সমগ্র মানব সমাজ শান্তি এবং সমৃদ্ধি রহিত হয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। সেই সত্য প্রতিপন্ন করে বেদে বলা হয়েছে—*ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।*

শ্লোক ৩৮

ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ ॥ ৩৮ ॥

ভূঃ—পৃথিবীর স্তর পর্যন্ত নিম্নলোক; **লোকঃ**—লোক; **কল্পিতঃ**—কল্পনা করা হয় অথবা কথিত হয়; **পদ্ভ্যাম্**—পদযুগল থেকে; **ভুবঃ**—ঊর্ধ্ব; **লোকঃ**—লোক; **অস্য**—তাঁর (ভগবানের); **নাভিতঃ**—নাভি থেকে; **হৃদা**—হৃদয় থেকে; **স্বর্লোকঃ**—দেবলোক; **উরসা**—বক্ষঃস্থল থেকে; **মহর্লোকঃ**—মহান ঋষি এবং মহাত্মাদের লোক; **মহাত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

পৃথিবীর স্তর পর্যন্ত সমস্ত অধঃলোক তাঁর পদযুগলে অবস্থিত। তার ঊর্ধ্বে ভূবর্লোক তাঁর নাভিদেশে অবস্থিত। তারও ঊর্ধ্বে দেবতাদের বাসস্থান স্বর্গলোক তাঁর হৃদয়ে অবস্থিত এবং মহান মুনি-ঋষিরা যেখানে বিরাজ করেন সেই মহর্লোক তাঁর বক্ষে অবস্থিত বলে কথিত হয়েছে।

তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডে চৌদ্দটি গ্রহলোক রয়েছে। নিম্নবর্তী গ্রহলোকগুলিকে বলা হয় ভূর্লোক, মধ্যবর্তী গ্রহলোকগুলিকে বলা হয় ভুবর্লোক, এবং ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চলোক ব্রহ্মলোক পর্যন্ত ঊর্ধ্ববর্তী গ্রহলোকগুলিকে বলা হয় স্বর্লোক। এই সমস্ত গ্রহলোকগুলি ভগবানের শরীরে অবস্থিত। অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কোন গ্রহলোক নেই।

শ্লোক ৩৯

গ্রীবায়াং জনলোকঽস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ।
মূর্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯ ॥

গ্রীবায়াম্—গ্রীবাদেশ ; **জনলোকঃ**—জনলোক ; **অস্য**—তাঁর ; **তপোলোকঃ**—তপলোক ; **স্তনদ্বয়াৎ**—স্তনদ্বয় ; **মূর্ধভিঃ**—মস্তক দ্বারা ; **সত্যলোকঃ**—সত্যলোক ; **তু**—কিন্তু ; **ব্রহ্মলোকঃ**—বৈকুণ্ঠ বা চিন্ময় লোকসমূহ ; **সনাতনঃ**—নিত্য।

অনুবাদ

সেই বিরাট পুরুষের গ্রীবাদেশে জনলোক অবস্থিত, স্তনদ্বয় তপোলোক এবং মস্তকে এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক সত্যলোক অবস্থিত। তার উর্ধে যে বৈকুণ্ঠলোক তা নিত্য (অর্থাৎ এই সৃষ্ট জগতের অন্তর্বর্তী নয়)।

তাৎপর্য

এই গ্রন্থে বহুবার আমরা জড়াকাশের অতীত বৈকুণ্ঠলোকের কথা আলোচনা করেছি ; এবং এই শ্লোকে সেই বর্ণনা সত্য বলে সমর্থন করা হয়েছে। এখানে *সনাতন* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবদ্গীতাতেও (৮/২০) নিত্যত্বের এই ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে এই জড় জগতের অতীত চিদাকাশে সবকিছুই নিত্য। কখনো কখনো ব্রহ্মার নিবাসস্থল সত্যলোককেও ব্রহ্মলোক বলে বর্ণনা করা হয়, কিন্তু এখানে যে ব্রহ্মলোকের উল্লেখ করা হয়েছে তা সত্যলোক নয়। এই ব্রহ্মলোক নিত্য, কিন্তু সত্যলোক নিত্য নয়।

এই দুয়ের পার্থক্য নির্ধারণ করার জন্য এখানে *সনাতন* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, এই ব্রহ্মলোক ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবানের আলয়। চিদাকাশে সবকটি গ্রহলোকই সাক্ষাৎ ভগবানেরই মতো। ভগবান সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, এবং তাঁর নাম, যশ, মহিমা, গুণাবলী, লীলা ইত্যাদি তাঁর থেকে অভিন্ন কেননা তিনি হচ্ছেন পরম তত্ত্ব। তাই ভগবানের পরা প্রকৃতির সবকটি গ্রহলোকই তাঁর থেকে অভিন্ন। সেই সমস্ত গ্রহলোকে দেহ এবং আত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এবং সেখানে এই জড় জগতের মতো কালের প্রভাব নেই। এইভাবে কালের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে ব্রহ্মলোকের চিন্ময় বৈকুণ্ঠলোক সমূহের কখনো বিনাশ হয় না। বৈকুণ্ঠলোকের সমস্ত বৈচিত্র্যও ভগবান থেকে অভিন্ন এবং তাই বৈদিক সূত্র *একমেবাদ্বিতীয়ম্* পূর্ণরূপে উপলব্ধ হয় সেই সনাতন পরিবেশের চিন্ময় বৈচিত্র্যের মাধ্যমে।

এই জড় জগৎ ভগবানের চিন্ময় ধামের বিকৃত প্রতিবিম্ব। তাই তা অলীক, এবং প্রতিবিম্ব হওয়ার ফলে তা কখনোই নিত্য নয়। দ্বৈত ভাব (চেতন এবং জড়) সমন্বিত এই জড় জগতের যে বৈচিত্র্য, চিৎ জগতের সঙ্গে তার কোন তুলনা হয় না। জ্ঞানের অভাবে অল্পবুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষেরা কখনো কখনো প্রতিবিম্বিত জগতের অবস্থাকে চিৎ জগতের অবস্থার সমান বলে মনে করে, এবং তার ফলে তারা ভগবানকে একজন সাধারণ বদ্ধ জীব বলে মনে করে এবং তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাসকে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ

জীবের কার্যকলাপের মতো বলে মনে করে। এই সমস্ত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের ভর্ৎসনা করে ভগবান *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১১)* বলেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্॥

ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি তাঁর পূর্ণ অন্তরঙ্গা শক্তি (আত্ম-মায়া) সহ অবতীর্ণ হন, কিন্তু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা ভ্রান্তিবশত তাকে জড় সৃষ্টির অন্তর্গত বলে মনে করে। শ্রীল শ্রীধর স্বামী তাই এই শ্লোকের ভাষ্যে যথাযথভাবে উল্লেখ করেছেন যে এখানে যে ব্রহ্মলোকের উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠলোক, যা সনাতন, এবং তাই তা পূর্বে বর্ণিত জড় সৃষ্টির মতো নয়। ভগবানের বিরাটরূপ জড় জগতের কল্পনা। চিৎ জগৎ বা ভগবৎ ধামের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

শ্লোক ৪০-৪১

তৎকট্যাং চাতলং ক্লিপ্তমূরুভ্যাং বিতলং বিভোঃ।
জানুভ্যাং সুতলং শুদ্ধং জঙ্ঘাভ্যাস্তু তলাতলম্॥ ৪০॥
মহাতলস্তু গুল্ফাভ্যাং প্রপদাভ্যাং রসাতলম্।
পাতালং পাদতলত ইতি লোকময়ঃ পুমান্॥ ৪১॥

তৎ—তাঁর; **কট্যাম্**—কোমরে; **চ**—ও; **অতলম্**—পৃথিবীর নিম্নবর্তী প্রথমলোক; **ক্লিপ্তম্**—অবস্থিত; **উরুভ্যাম্**—জঙ্ঘায়; **বিতলম্**—নিম্নবর্তী দ্বিতীয়লোক; **বিভোঃ**—ভগবানের; **জানুভ্যাম্**—জানুদ্বয়; **সুতলম্**—নিম্নবর্তী তৃতীয়লোক; **শুদ্ধম্**—শুদ্ধ; **জঙ্ঘাভ্যাম্**—জঙ্ঘাদ্বয়; **তু**—কিন্তু; **তলাতলম্**— নিম্নবর্তী চতুর্থলোক; **মহাতলম্**—নিম্নবর্তী পঞ্চমলোক; **তু**—কিন্তু; **গুল্ফাভ্যাম্**—গুল্ফদ্বয়ে অবস্থিত; **প্রপদাভ্যাম্**—পায়ের সম্মুখ ভাগে; **রসাতলম্**—নিম্নবর্তী ষষ্ঠলোক; **পাতালম্**—নিম্নবর্তী সপ্তমলোক; **পাদতলত**—পায়ের তলদেশে; **ইতি**—এইভাবে; **লোকময়ঃ**—লোকে পূর্ণ; **পুমান্**—ভগবান।

অনুবাদ

হে পুত্র নারদ, আমার থেকে অবগত হও যে ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে সাতটি হচ্ছে অধঃলোক। অতল নামক প্রথম লোকটি সেই বিরাট পুরুষের কটিদেশে অবস্থিত; দ্বিতীয়লোক বিতল তাঁর উরুদ্বয়ে অবস্থিত, তৃতীয়লোক সুতল তাঁর জানুদ্বয়ে অবস্থিত, চতুর্থলোক তলাতল তাঁর জঙ্ঘাদ্বয়ে অবস্থিত, পঞ্চমলোক মহাতল তাঁর গুলফদ্বয়ে অবস্থিত; ষষ্ঠ রসাতল তাঁর পদদ্বয়ের অগ্রভাগে অবস্থিত এবং সপ্তমলোক পাতাল তাঁর পদতলে অবস্থিত। এইভাবে ভগবানের বিরাট রূপ সমস্ত লোকে পূর্ণ।

তাৎপর্য

আধুনিক উদ্যোক্তারা (যে সমস্ত মহাকাশচারীরা মহাশূন্যে ভ্রমণ করেন) শ্রীমদ্ভাগবত থেকে মহাকাশের চতুর্দশ ভুবন সম্বন্ধে তত্ত্ব সংগ্রহ করতে পারেন। ভূলোক নামক এই পৃথিবী থেকে তাঁর স্থিতি পরিগণিত হয়। ভূলোকের ঊর্ধ্বে ভুবর্লোক, তার উপর যথাক্রমে রয়েছে স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সর্বোচ্চ লোক হচ্ছে সত্যলোক। এগুলি সপ্ত ঊর্ধ্বলোক। তেমনই সাতটি অধোলোক রয়েছে, যেগুলির নাম হচ্ছে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল এবং পাতাল। এই সমস্ত লোকগুলি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, যার বিস্তার হচ্ছে দুই হাজার কোটি গুণ দুই হাজার কোটি বর্গমাইল।

আধুনিক মহাকাশচারীরা কেবল পৃথিবী থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে ভ্রমণ করতে পারে, এবং তাই আকাশে তাদের ভ্রমণ করার প্রচেষ্টা অনেকটা বিশাল মহাসাগরের তীরে শিশুর খেলার মতো। চন্দ্র ঊর্ধ্বলোকের তৃতীয় স্তরে স্থিত, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধ থেকে বিশাল জড় আকাশে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন গ্রহের দূরত্ব আমরা জানতে পারি। আমরা যে ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছি সেটি ছাড়া আরো অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে, আর এই সমস্ত জড় ব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টি, উল্লিখিত সনাতন ব্রহ্মলোক নামক চিদাকাশের কেবল একটি নগণ্য অংশ মাত্র। পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে ভগবদ্গীতার (৮/১৬) নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে বুদ্ধিমান মানুষদের তাদের নিত্য আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন—

আব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকা পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

সনাতন ব্রহ্মলোকের ঠিক নীচে অবস্থিত, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক সত্যলোক থেকে শুরু করে, যার বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে, সমস্ত লোকগুলি জড়। এই জড়লোকগুলির যে কোন একটিতে জীবের অবস্থান প্রকৃতির নিয়ম অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির অধীন। কিন্তু কেউ যখন সনাতন ভগবদ্ধাম ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন, তবে তিনি সম্পূর্ণরূপে পূর্বোল্লিখিত জড় ক্লেশগুলি থেকে মুক্ত হন। তাই মনোধর্মী এবং যোগীদের কল্পিত মুক্তি তখনই লাভ করা সম্ভব হয় যখন কেউ ভগবানের ভক্ত হন। যে ভগবানের ভক্ত নয়, সে কখনো ভগবানের ধামে প্রবেশ করতে পারে না। চিন্ময় স্তরে সেবাবৃত্তি অর্জন করার ফলেই কেবল ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়। তাই প্রকৃত মুক্তি লাভের জন্য মনোধর্মী জ্ঞানী এবং যোগীদের সর্বপ্রথমে ভগবদ্ভক্তির প্রতি আকৃষ্ট হতে হবে।

শ্লোক ৪২

ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকহস্য নাভিতঃ।
স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্ধ্না ইতি বা লোককল্পনা॥ ৪২॥

ভূর্লোকঃ—পাতাল থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্তলোক ; **কল্পিতঃ**—কল্পনা করা হয়েছে ; **পদ্ভ্যাম্**—পদযুগলে স্থিত ; **ভুবর্লোকঃ**—ভুবর্লোক ; **অস্য**—ভগবানের এই বিশ্বরূপের ; **নাভিতঃ**—নাভিদেশ থেকে ; **স্বর্লোকঃ**—স্বর্গলোক থেকে শুরু করে উর্ধ্বলোক সমূহ ; **কল্পিতঃ**—কল্পনা করা হয়েছে ; **মূর্ধ্না**—বক্ষঃস্থল থেকে মস্তক পর্যন্ত ; **ইতি**—এইভাবে ; **বা**—অথবা ; **লোক**—লোকসমূহ ; **কল্পনা**—কল্পনা।

অনুবাদ

অন্যেরা ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র লোকসমূহকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারে। যথা, ভগবানের বিরাট রূপের পদযুগলে অবস্থিত পাতাল লোক থেকে শুরু করে এই পৃথিবী পর্যন্ত ভূর্লোক, নাভিদেশে অবস্থিত ভুবর্লোক, এবং বক্ষ থেকে শুরু করে মস্তক পর্যন্ত স্বর্গলোক নামক উর্ধ্বলোকসমূহ।

তাৎপর্য

এখানে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে ; অন্যেরা ব্রহ্মাণ্ডকে চতুর্দশ ভুবন সমন্বিত বলে কল্পনা করে। এখানে তারও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইতি 'সর্বকারণের কারণ' নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।